সুবর্ণা

সুশীল রায়

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : দেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদমুদ্রণ : নিউ প্রাইমা প্রেস

উৎসর্গ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

করকমলেষু

অন্তরঙ্গতায় ও আত্মীয়তায় যাঁর জুড়ি নেই, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ নবীন কি প্রবীণ এ ভেদাভেদ যিনি করেন না, গত চারটি দশক যিনি বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার সাহিত্যিকদের সহচর ও সুহৃদ, শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে উত্তরা পত্রিকা সম্পাদনা ক'রে যিনি সাহিত্যিক নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন, স্বয়ং যিনি মনে-প্রাণে চিরতরুণ, কাশীতে তাঁর সঙ্গে ১৩৬০ সালের পূজাবকাশ-যাপনের সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা স্মরণ ক'রে এই বই তাঁর হাতে অর্পিত হল।

— লেখক

এই লেখকের

একদা

ত্রিবেণী

রুদ্রাক্ষ

পাঞ্চালী

গল্পসঞ্চয়ন

আকাশস্বপ্ন

মনীষী-জীবনকথা

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

আজ তার মনে হচ্ছে, সত্যিই সে রাজা। হাতের [illegible] পায়ের বেড়ি খুলে গেছে, বুকের পাথরও নেমে গেছে। মাথার উপরে প্রকাণ্ড ওই আকাশ, চোখের সামনে সীমানাহীন সমুদ্রের মত ওই জলের অরণ্য।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

রাজারাম বলল, বেরিলি।

—সে কদ্দুর?

—অনেক দূর।

মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা, চোখ দুটো উগ্র উত্তাপে ভরা। দুই হাতে কব্জির কাছে কালো দাগ— কড়া পড়ার দাগ নয়, লোহার বালা পরলে অনেকটা এম্‌নি দাগ পড়ে।

সীমানাহীন সমুদ্রের মত জলের অরণ্যকে উচ্চকিত ক'রে ঝরঝর শব্দে ছুটে চলেছে ষ্টিমার।

এই জল দেখে প্রাণমন খুশিতে ভরে উঠছে তার। এমনি জল আরও সে দেখেছে, এমন নদী আরো অনেক চেনে সে। কিন্তু সেসব কথা এখন সে ভাববে না। এখন সে চলেছে তার প্রাণের মানুষকে খুঁজতে। পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই কয় বছরে কত বড়টা হয়েছে সে? রাজারাম চোখ বুজল। চোখ বুজে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যেন তাকে, রাজারামের দিকে যেন সে তাকিয়ে—

—কি সাহেব, ঘুম ধরল নাকি?

পাশের লোকটা তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজারাম বিরক্ত হল না। ইষ্টিমারে ওঠার পর থেকে লোকটা তার

পিছনে লেগেই আছে। অনবরত জিজ্ঞাসা করছে নানান কথা। লোকটা রাজারামকে কোনোরকম সন্দেহ করছে বোধ হয়— গুণ্ডা বা বদমায়েশ, চোর বা ডাকাত।

বুকের মধ্যে হাঁটু-ছুটো নিয়ে ছ'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ডেকের উপর চুপচাপ বসে আছে রাজারাম, গোয়ালন্দ থেকে ইস্টিমারে ওঠার পর থেকেই। এপাশে বাক্স-প্যাটরার ভিড়, ওপাশে আনাজ-কলা-তরি-তরকারির; ডিম ও মুর্গীর ঝুড়ি জড়ো করা সিঁড়ির ধারটায়। রাজারাম ভেবেছিল, এই জায়গাটাই তার পক্ষে নিরাপদ। এটা যখন মাল-গুদামের শামিল, এখানে তবে লোকের আনাগোনা থাকবে না, নিরবিলি চুপচাপ একা একা একমনে নানাকথা ভাবতে ভাবতে চট্ করে সে নেমে পড়বে শিবলায়। কিন্তু যাত্রাপথে সহযাত্রী নাকি থাকেই।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, নামা হবে কোথায় ?

জবাব দিল না রাজারাম। উঠে দাঁড়াল। ঢেউ। ইস্টিমারের পিছনে দৈত্যের মত উঁচু হয়ে সার সার ছুটে চলেছে ঢেউয়ের মিছিল। ডেকের উপর তার পা-ছুটোই আছে, তার প্রাণ মন অন্তর আত্মা অমনি তীব্র বেগে সার সার ছুটে চলেছে যেন তার আগে আগে।

ইস্টিমারের ছ'পাশে ছুটো গলি। রাজারাম একটু ঘুরে বেড়াতে চায় হয়তো। টানা পাঁচ বছর ফাটকে আট্‌কে থেকে তার হাড়ে-মাসে মরচে পড়া হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু তা যেন নয়। তার সারা শরীরে নতুন সামর্থ্য যেন এসেছে। রেলিঙে ভর দিয়ে জল দেখছে— পদ্মার ঘোলাটে জল। ও জলে ছায়া হয়তো পড়ে না কারও। এতটা ঝুঁকে উঁকি দিচ্ছে, তবু দেখতে পাচ্ছে না নিজেকে। একবার ফিরে তাকাল, লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। বড় অস্বস্তি ঠেকছে রাজারামের। সে এগিয়ে চলল তাই। ছুটো লোহার দৈত্য পাল্লা দিয়ে ওঠা-নামা

করছে— গালে-কপালে আঁচ লাগছে রাজার। এটা বুঝি ইষ্টিমারের হৃৎপিণ্ড। দৈত্য দুটোকে ওভাবে ছটফট করতে দেখে রাজার ভেতরটাও কেন-যেন হাঁসফাঁস ক'রে উঠল। পাঁচটা বছর তো কম কথা নয়। এই কয় বছরে কত ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। সে গিয়ে যদি দেখে, লবঙ্গ একেবারে বদলে আলাদা-রকমের হয়ে গেছে।

রাজারাম দাঁড়াল না। ফিরে এসে আগের জায়গায় ঠিক আগের মত হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে আগের মতই বসল।

লোকটা বলল, বেরিলিতে কি করা হত?

রাজারাম মুখ তুলে তাকাল, বলল, কুছ নেহি।

—বিলকুল বেকার?

না, বেকার ঠিক নয়। সে ছিল কয়েদী। খুনের দায়ে তার ফাটক হয়েছিল দশ বছরের। কিন্তু আদ্দেক বছর মাপ হয়ে গেল। কিসের খুন, কিসের কয়েদ, আগাম খালাসই-বা হল কেন— এত কথা এখন তো আর খুলে বলা যায় না। রাজারাম চুপ করে রইল।

জবাব না পেয়ে লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করল, দেশ কোথায়?

—পঞ্জাব।

লোকটা কি-যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তার পর বলল, শিবলায় কেউ আছে বুঝি?

—জানা-শোনা আদমি আছে অনেক। লড়াইএর মধ্যে এইদিকেই কাজ-কারবার ছিল।

—হুঁ। লোকটা মাথা নাড়ল, বলল, সেপাই ছিলে বুঝি?

রাজারাম মাথা নেড়ে জানাল, না, সেপাই সে ছিল না। বলল, টাইগার সাহেব ছিল— মেজর টাইগার। কিষ্টপুরী ক্যাম্পে। চেন তাকে?

লোকটা যেন চিনে ফেলল, টান হয়ে বসে বলল, যে সাহেবটা খুন হয়ে গেল ? বদমাশ !

রাজারাম মাথা নাড়ল।

নোঙর পড়ছে। ঘড়ঘড় আওয়াজে লোহার লম্বা শিকল নেমে যাচ্ছে জলের তলে। ইষ্টিমারে একটা ব্যস্ততার ঝড় উঠেছে যেন। কোলাহলে আর কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে চারদিক।

কী যেন জিজ্ঞাসা করল লোকটা, রাজারাম শুনতে পেল না। শুনতে পেলেও জবাব হয়তো সে দিত না।

লোকটা বলল, নামটা জানতে পারি ?

—রাজারাম আহির। আপনার নাম ?

—নিকুঞ্জ সাহা।

চারদিকে কলরব-কোলাহল। তারই মাঝখানে এই দুইজন মুখোমুখী চুপচাপ বসে। দুজন কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু দূর থেকে এই দুজনকে দেখলে মনে হবে এরা যেন দুজনে পরম আত্মীয়।

নিকুঞ্জ বলল, টাইগার মানে জানেন রাজারাম ? ওই লোকটা ছিল নাকি ও তল্লাটের বাঘ। ওর অত্যাচারে—

রাজারাম যেন স্থির হয়ে বসতে পারছে না। বলল, থাক ওকথা।

থাক্। নিকুঞ্জ একদৃষ্টে চেয়ে রইল রাজারামের মুখের দিকে। কেমন যেন মনে হচ্ছে নিকুঞ্জর। মামলাটার শুরুটুকু তারা জানত, তার পর শেষ হল কোথায় অত খবর আর রাখা হয় নি। ঘটনাও হয়ে গেল অনেকদিনের, প্রায় বছর পাঁচ। সেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঘটেছিল ঘটনাটা।

অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে রাজারাম। ওদিকে সিঁড়ি পড়ছে।

পারের গায়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে ইষ্টিমার। চীৎকার ও চ্যাঁচামেচিতেও যেন সে বিচলিত হচ্ছে না।

—কি সায়েব, নামবে না? নিকুঞ্জ রাজারামের গায়ে আস্তে ধাক্কা দিল।

চমকে উঠল রাজারাম। হকার ও কুলির ভিড় যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেছে। মাথায় মাথায় নেমে যাচ্ছে বাক্সের সারি আর বেডিংএর স্তূপ।

—শিবলা। শিবলা।

ইষ্টিশানের নাম হেঁকে গেল ও কে?

রাজারাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্তে। আপনি নামবেন না?

নিকুঞ্জ বলল, আমি যাব তারপাশা।

আর-কোনো কথা না বলে রাজারাম এগিয়ে গেল। নিকুঞ্জ বসে বসে দেখল, ওই জনারণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। টাইগার সাহেবের নাম বলল কেন ও, সে-প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলাপ করতে চাইলই-বা না কেন? কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে নিকুঞ্জর। উপর-উপর দেখে তো আর লোক চেনা যায় না। এ লোকটা হয়তো ছিল টাইগার সাহেবেরই সাঙাত। নিকুঞ্জর মনে কেমন খটকা লেগে গেল। মহাদেবপুরের রামেশ্বর হাজরার নাম মনে পড়ে নিকুঞ্জর—খুনের মামলায় তাকেও জড়ানো হয়েছিল, কিন্তু বেকসুর খালাস পেয়ে যায় সে। এটুকু নিকুঞ্জরা তারপাশাতে বসেই জানতে পেরেছে। কিন্তু যা সবাই ভুলে বসেছিল, খুঁচিয়ে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে সরে পড়ল কেন ওই লোকটা? মাথায় কুচি-কুচি চুল, হাতে লোহার বালার কালো দাগ। শতরঞ্চিটা জড়ানো ছিল, এখন জায়গা পেয়ে সেটা ছড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল নিকুঞ্জ।

দেশটাও ফেঁড়ে দুভাগ হয়ে গেল, আর যত গুণ্ডা বদমাশের আমদানিও শুরু হল। তাদের গাঁয়ের ছয়-সাত ঘর লোক পদ্মা পাড়ি দিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতায় নবদ্বীপে আর শান্তিপুরে চলে গেছে। নিকুঞ্জরাই-বা আর কতদিন টিঁকে থাকতে পারবে, বলা যাচ্ছে না। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে দিয়ে এই বুড়োবয়সে ঘরই-বা বাঁধবে কোথায় গিয়ে। অবথাই ট্যাঁকে হাত দিয়ে সে যেন তার রেস্ত খুঁজল। আজ পাঁচ দিন, এই পাঁচ দিন হল তারা স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশটা ছেড়ে যাবার সময় এমন মোক্ষম কামড় দিয়ে গেল কেন ওরা, নিকুঞ্জ তাই যেন ভাবছে। টাইগার সাহেবের জাতটাই বুঝি এমনি।

শিবলা ছেড়ে চলেছে ইষ্টিমার। নদী নয়, এ যেন জলের মহা-সমুদ্র। সেই মহাসমুদ্র মন্থন করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে নিকুঞ্জরা। পারে দাঁড়িয়ে ছিল রাজারাম: ইষ্টিমারের ধোঁয়া শূন্যে মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে, পাখির ঝাঁকেদের গায়ে ধোঁয়াগুলো গিয়ে ঠেকছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। বিকালের পড়ন্ত রোদে পরিচিত মাটির উপর দাঁড়িয়ে রাজারাম বুঝি কাঠ হয়ে গেছে।

কাঠ হয়ে সে যেত না। তার মাথার চুল ও হাতের দাগ এই দুটিই তার কাছে সবচেয়ে বড় বাধা। হাঁটতে গেলে পায়ে পা আজ জড়িয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এমন ধাতের মানুষ সে কখনোই নয়। তার শরীরে তাগত আছে, তার মনেও জোর আছে। কিন্তু কেবলই তার মনে হচ্ছে, রামেশ্বররা তাকে আজ চিনবে কি না। বহু দূরদেশের লোক সে, অনেকদিন ধরে এদিকে থাকায় এদিককার কথাও বুঝত, কাজ চালানো মত বলতেও শিখেছিল; কিন্তু আজ সেসবের কোনো সুযোগ সে পাবে কিনা, এই তার ভয়। যোগেশ

মহাপাত্র, কেশব, কৌশিক— ঝালিয়ে নিল রাজারাম— নামগুলো তার পরিষ্কার মনে আছে। লোকগুলোর মুখও তার স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। কিন্তু যার কথা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, তার নাম সে উচ্চারণই করছে না, মনে-মনেও না।

রামেশ্বরের মেয়ে সে, নাম লবঙ্গ।

এ যে চেনা রাস্তা, ও যে চেনা সাঁকো। জলতরঙ্গের বাজনা সে শোনে নি। কিন্তু তার মনের মধ্যে এখন যা বেজে বেজে উঠছে, এটাই বুঝি জলতরঙ্গ। জল আর তরঙ্গ টাটকা পাড়ি দিয়ে আসার দরুনই বুঝি এই নামটাই তার মনে পড়ল।

দু চোখের জল গড়িয়ে এসে নাকের ডগায় নোলকের মত টল-টল করছিল লবঙ্গর। সেই চোখের জলের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল রাজারাম। টাইগার সাহেবকে এক ঘুষিতে কাবু করে দিয়েছিল সে। লোকটা এমন বেইমান, একটা ঘুষি খেয়েই সাফ হয়ে গেল। আর লম্বা জেল হয়ে গেল রাজারামের। লোকটার ভিতরে তো পদার্থ ছিল না, যা ছিল তা ঝামা; মদ খেয়ে খেয়ে তা আবার ঝাঁঝরি করে ফেলেছিল। সেদিন ছিলও লোকটা বুঁদ হয়ে —আদ্দেক মরেই ছিল আর-কি। ঘুষি তো দূরের কথা, একটা চিম্‌টি কাটলেও হয়তো মরে যেত। লোকটা মরে রাজারামকে দাগী করে দিয়ে গেল, রাজারামের এটা মস্ত আক্ষেপ। সে যে চোখের জলের মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পেরেছিল এটা তার গৌরব; সে সমুদ্র সাঁতার দিয়ে আজ সে পারে এসেছে। পারে এসে খুঁজছে সে সেই নোলক। আসলে লবঙ্গর নাকে নোলক কিন্তু ছিল না, ছিল একটা নাকছাবি।

যেখানে ছিল মাঠ ঘাট বন ও বাদাড়, সেখানে চওড়া-চওড়া সড়ক

বসিয়েছে রাজারাম। লাহিড়ি-ইস্পাহানি কোম্পানির হয়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তাকে, অনেক ঝামা গুঁড়ো করে ফেলতে হয়েছে, অনেক পাথর রোলার দিয়ে পিষে দিতে হয়েছে। সেই হাজার হাজার ঝামা ও পাথরের সঙ্গে টাইগারটাও পিষে গেল, এ বড় বেশি কথা নয়। কিন্তু লোকটা তাকে—

রাজারাম তার দু হাতের কালচে কালচে দাগের দিকে তাকাল। সন্ধ্যে ঠিক নয়, একে বলে গোধূলি— এই গোধূলির ঘষা আলোতেও সে স্পষ্ট দেখতে পেল দাগ। এ দাগের জন্যে তার সংকোচ আছে বটে, কিন্তু এটা কলঙ্কের চিহ্ন কখনোই নয়— এটা তার গৌরবের সাক্ষী। সে নিজে যাকে গৌরব বলে মনে করছে, আর পাঁচজন সেটা গৌরব বলে ভাবছে কি না— এইটেই তার মনের প্রথম প্রশ্ন। এর সঠিক জবাব পায় নি বলেই তার যত ভয়। তার উপর, রামেশ্বরের দুয়ারে গিয়ে ঘা দিয়ে কি ব'লে ডাকবে সে তাকে। রামেশ্বর দৌড়ে এসে হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরবে, নয়তো তাকে তাড়িয়ে দেবে। এ দুয়ের কোন্‌টা যে সত্যি ঘটবে তা সে জানে না।

যাই ঘটুক, তাকে যেতে হবে। রাজারাম এবার দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে লাগল। যাই ঘটুক, এবার যেন সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওই একটা তারা, রাজারাম আর একটু উপর দিকে তাকাল, একটা আধ-ভাঙা রং-চটা চাঁদ কাৎ হয়ে ঝুলে আছে।

কাঠগুদামের ফাটক থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে সে বেরিলিতে গিয়ে ট্রেন নেবার সময় একবার দ্বিধায় পড়েছিল। সে দ্বিধা কাটিয়ে সে এই দিকেই চলে এল। দেশে তার বাপ আছে, ভাই আছে, বহিন আছে, মা আছে— তাদের কাছেই আগে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু শেষবেশ তা গেল না। রামেশ্বরদের সঙ্গে আগে দেখা ক'রে

তার পর সে বাপ-মার কাছে যাবে ঠিক করে চলে এল গোয়ালন্দে। পঞ্চনদীর দেশের লোক সে, সে নদীদের ডাক তুচ্ছ করে একটি নদী পদ্মার ডাকে সাড়া সে দিল কেন, সে প্রশ্ন এখন থাক্। পাঁচের থেকে এক অনেক সময় বড় হয়ে নাকি যায়। রাজারাম হয়তো তার প্রমাণ দেখাল।

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে প্রান্তরে। শিবলা থেকে মহাদেবপুরে যাবার লম্বা রাস্তাটা মাঠের মাঝখান দিয়ে চপল ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে খেলা করতে করতে যেন ছুটে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। জেলখানার নীরব কড়াপাহারা ও আইন-কানুনের কংক্রিটের বেড়া ডিঙিয়ে এই প্রকাণ্ড অনিয়মের মাঝখানে এসে রাজারামের মনে হল এ যেন নতুন জগৎ। ওই যেখানে মাঠের শেষ, সেখানে আমের নিবিড় কুঞ্জ ও বটের সারি সীমান্তের প্রহরী সেজে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের চোখে ভ্রূকুটি নেই, পীড়নের নির্দয় আস্ফালন নেই। তারা বাধা দেয় না, তারা যেন আহ্বান করে। মাঠের মাঝে মাঝে খেজুর আর নারকেলের গাছ ছড়ানো ছিটানো, আবছা অন্ধকারে মনে হচ্ছে সঙিন কাঁধে দিয়ে শান্ত্রীরা যেন খাড়া-পাহারা দিচ্ছে। রাজারামের জীবনের সঙ্গে এরা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না। সাঁ সাঁ শব্দে হাওয়া বয়ে গেল কানের কাছ দিয়ে। অন্ধকারে অদূরে চুল ওড়াচ্ছে ওরা কারা? আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সে দেখল আখের ক্ষেত। সমস্ত মাঠে ক্রমে নেমে এল জমাট অন্ধকার। রং-চটা চাঁদে রং ধরেছে আবার, কিন্তু এ মাঠে আলো দেবার পক্ষে সে জৌলুস যথেষ্ট নয়। যে তারাটায় প্রথম চোখ পড়েছিল রাজারামের সেটা এখন মিশে গেছে আরও পাঁচটা তারার সঙ্গে। রাজারাম ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। পথঘাট সব তার চেনা, ভাবনা কি? দ্রুত পা চালাল সে এবার।

আরও একটু যাবার পর সে শিবলার সীমান্ত পার হয়ে ঢালুতে নামা মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল রাজারাম।

রাজারাম আমাদের চোখের আড়াল দিয়ে এগিয়ে যাক। এই সুযোগে আমরা বছর কয়েক পিছিয়ে আসতে পারি। শিবলা বাইনাজুড়ি কিষ্টপুরী ধানকোড়া মহাদেবপুর— এই পঞ্চগ্রামের পথেঘাটে সবচেয়ে অপরিচিত আর সবচেয়ে নতুন বলে যাকে ঠেকত, সে লাহিড়ি-ইস্পাহানি কোম্পানির রাজারাম। গড়াতে গড়াতে যুদ্ধ যত কাছে সরে আসছে, তত বেশি শব্দ করে মাঠের বুকের উপর দিয়ে এখানে গড়িয়ে চলেছে স্টিম-রোলার। রাস্তা বানানো হচ্ছে, হাসপাতাল বসানো হচ্ছে, ক্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। ইঁট-পাথর লোহা-লক্কড়ের চাপে মাঠের বুকের কচি ঘাস ঝলসে যাচ্ছে রাতারাতি। বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে চওড়া সড়ক তৈরি হবে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত। নানান জায়গা থেকে নানারকমের কুলি আমদানি করা হয়েছে— রাজারাম তাদের উপর খবরদারি করার চাকরি জোগাড় করে এখানে এসে পদার্পণ করল। একেবারে আনকোরা গাঁ থেকে আমদানি করা লোক— তাগদটা ছিল বলেই হয়তো এত বড় দরের চাকরি পেয়ে গেল। লোকটাকে একটু চালাক-চতুর দেখেই কেম্পানির মালিকেরা তাকে এ-কাজে বহাল করে থাকবে। তার উপর লোকটা খাটতেও পারে। রাজারাম ভাবে এ আবার খাটনি নাকি। খাটতে পারে তার বাপ— কৃপারাম। পাঁচটা গোরু, সাতাশটা ভঁইস— একা একা দেখে তার বাপ। তাদের ঘাড়-গলা-পিঠ রগড়ে নিত্যি নাওয়ানো, রোজ দু বেলা দুধ দোওয়া, কাটুবায় গিয়ে দুধ বেচা— সব একাই করত তার বাপ। হালে নাহয় তারা তিন ভাই বাপের সঙ্গে কাজে নেমেছিল; কিন্তু সেও চলে এল, শুকদেব আর সহদেব বাপের সঙ্গে কতটা কাজ করছে তা সে জানে না।

শিবলা থেকে তার যাত্রা শুরু। তাদের কোম্পানি এখান থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা বানাবার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে। একটু একটু করে পথ এগোয়, রাজারাম সেই সঙ্গে দলবল নিয়ে এগোতে থাকে। এই কাজের ভিড়ে সারাটা দিন সে থাকে মশগুল, কাজ থেকে একটু ছাড়া পাওয়া মাত্র তার মন উড়ু উড়ু ক'রে ওঠে। শিবলার মাঠ ছেড়ে তার মন ছুটে যায় সুচেতপুরে— তার বাপ-মা-ভাই-বোনদের কাছে। মনের রাশ টেনে ধরে পরদিন সকালে আবার সে ষ্টিম-রোলারে উগ্র ধোঁয়া আর ইঁট-পাথরে মন লাগায়। যার জীবন কাটল গোশালার সঙ্গে গাঁয়ের পথে পথে, তাকে আচমকা এমন কঠিন কাজে জুতে দিলে মাঝেমাঝে মন পালাই-পালাই অবশ্যই করবে। তার উপর একেবারেই সে একা। যখন ছুটি পায় তখন সময় কাটাবার মত একজন সঙ্গী পর্যন্ত পায় না। হঠাৎ এক অচেনা রাজ্যে এসে পড়লে এমন হবে, এ আর বেশি কি।

মাস-চারের মধ্যে রাস্তাটা মহাদেবপুরে এসে পৌছল। রাজারামও এসে পৌছল মহাদেবপুরে। পথের ধারে তার গুম্‌টি— চৌকো একটা কাঠের ঘর, বড় বড় কাঠের চাকা লাগানো। ষ্টিম-রোলার যত এগোয়, তার এই গাড়িটাও ততই এগিয়ে আসে। এটাই তার কাজ-কারবারের ঘাঁটি, এটাই তার ঘরবাড়ি। জীবনটা যদি ঠিক এইভাবে ধীরে ধীরে এক লাগাড়ে গড়িয়ে যেত— তাহলে কথা ছিল না। একদিন এই স্বচ্ছন্দ গতি হঠাৎ একটা হোঁচট খেল। চোখ তুলে রাজারাম দেখল, ও যায় কে? তখনই এর জবাব পায় নি, পরে জেনেছে ওর নাম লবঙ্গ।

বিস্বাদ গুম্‌টি সেদিন হঠাৎ মিষ্টি বলে ঠেকল তার। তার নিঃসঙ্গ জীবনটা হঠাৎ যেন মনে হল সঙ্গীময়। একঘেয়ে এই একটানা

কাজের মধ্যেও আচমকা একটা সংগতি যেন এসে গেল। রাজারাম কেবলই ভাবতে লাগল, কে ও ? পরনে খড়কে-ডুরে, হাতে রুপোর বালা, নাকে নাকছাবি।

তাতা বালুকার সীমাহীন দেশে হঠাৎ কোনো জলের রেখা দেখলে প্রাণমন যতটা ঠাণ্ডা হবার কথা, রাজারাম যেন ততটা আরাম বোধ করল। এ একটা নতুন স্বাদ। জীবনে এই প্রথম এ রকমের আস্বাদ সে লাভ করল। রাজারাম খুশি। যাকে দেখে সে খুশি, সে বিদ্যুতের একটা ক্ষণিক ঝিলিকের মত তার চোখে আলোর ঝাপটা দিয়ে ইতিমধ্যেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে। তাতে কোনো পরোয়া নেই রাজারামের, সে তার গুমটিতে বসে মনে করছে— আজ এক নিমেষে চট্ করে সে মহাদেবপুরের রাজাই হয়ে গেল বুঝি। কে তাকে নিমেষে এমন রাজা করে দিল ? কে সে ? পরনে খড়কে-ডুরে, হাতে রুপোর বালা, নাকে নাকছাবি।

কিছু যেন দাবি নেই, কিছু চাহিদাও নেই তার। যা পেয়ে গেছে, তাই যেন তার চরম পাওয়া।

কিছুই চায় না বটে, কিন্তু পরদিন ঠিক এমনি সময় সে কার প্রতীক্ষায় যেন বসে রইল, গুমটির জানলায় চোখ রেখে। কিন্তু সময় উৎরে গেল. সে পথে কেউ কোনো দিক থেকে এল না। কিছুই চায় না বটে, কিন্তু মনে হল, কিছু একটা সে যেন পেল না। কাল মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, আজ সেই মনই হয়ে গেল স্যাঁৎসেঁতে।

দিন কয়েক রাজারাম এমনি প্রতীক্ষা নিয়ে অযথা বসে বসে অবশেষে সে ডুব দিল তার কাজের মধ্যে। সাঁওতালি কুলি ও কুলি-কামিনীর দল অযথাই তাকে হয়রান করছে। তাদের কাজে এত

গলতি হচ্ছে কেন, ভেবেই পায় না রাজারাম। কিন্তু কাজে তারা সত্যিই ফাঁকি দিচ্ছে, না, রাজার মনটাই ফাঁকা হয়ে গেছে— ঠিক যেন বোঝে না সে।

ইঁটের খোলায় ধোঁয়া উঠছে। মাটি কেটে কেটে ঝুড়ি ভরতি করে নিয়ে আসছে কুলিরা। কাদার স্তূপ পড়ে আছে ওদিকে। কাঠের ছাঁচে ঢালাই হচ্ছে ইঁট। এল. আই. সি. মার্কা কাঁচা ইঁট সাজানো। দূর থেকে দেখে মনে হয়, খুপরিওলা মস্ত একটা খেল্‌না ঘর। এই কাদা পুড়িয়ে লাল ইঁট তৈরি হবে। নরম মাটি পুড়ে হবে রাঙা পাথর। রাজার মনটাও তো ছিল অমনি কাদার মত। সুচেতপুর গাঁয়ে তাকে সবাই বলত নরম মানুষ। তাদের গাঁয়ের চৌকিদার মণিলাল তাকে কত শাসিয়েছে, বলেছে, দয়া মায়া স্নেহ প্রীত্‌ সব ছোড় দো, দুনিয়ামেঁ উও সব ঝুট হ্যয়। সবই নাহয় ঝুট হল, কিন্তু এই মহাদেবপুর, ওই ইঁটের পাঁজা, সেই খড়কে-ডুবে এসব ঝুট হয় কী করে। নরম মানুষ রাজারাম অনেক শক্ত হয়েছে, কিন্তু সে ঝামা তো হতে পারে না।

শান্তনু লাহিড়ি আসছেন এদিকে। পরনে ট্রাউজার, গায়ে হাতকাটা শার্ট, চোখে কালো কাঁচের চশমা।

গুম্‌টির গায়ে হেলান দিয়ে রোদ থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল রাজারাম। বাইশ ফুট চওড়া রাস্তা, জরিপ করে দাগ দেওয়া হয়ে গেছে। মাটি কেটে লেভেল তৈরি হচ্ছে, কাল খোয়া ঢালাই হবে।

শান্তনু বলল, কুলি এদিকে বেশি আছে, আমি জনা পাঁচ নিয়ে যাব। সাত দিনের মধ্যে কিষ্টপুরীতে একটা ক্যাম্প বেঁধে দিতে হবে।

কৈফিয়ত দেবার দরকার ছিল না, কিন্তু লাহিড়ি একটু বেশি কথা

না বলে পারে না। যার কুলি সে টেনে নিয়ে যাবে তাতে রাজার বলার কী আছে? লাহিড়ি বলল, পেরে উঠবে তো? তোমার কাজ যেন বন্ধ না থাকে।

—লেকিন— রাজা কিছু বলার চেষ্টা করল হয়তো।

লাহিড়ি বলল, লেকিন আবার কী। যা থাকল তাদের চাপ দিয়ে কাজ আদায় করে নাও। বোমা পড়ে আদ্দেক কুলি যদি সাবাড় হয়েই যায়, তাতেও তো কাজ টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঝরাস্তায় এসে গা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে তো পারি নে।

লাহিড়ি চলে গেল, বলে গেল চট্‌ করে পাঁচটা কুলি তার আপিসে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিষ্টপুরীতে ক্যাম্প। যুদ্ধ তবে বুঝি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। এখানে আবার ঘাঁটি করা হচ্ছে। এখানে বসে দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানা হচ্ছে না। তার দেশে যুদ্ধের দরুন নতুন কোনো অশান্তি আরম্ভ হয়েছে কি না, জানতে ইচ্ছা করে রাজারামের। লাহিড়ি সাহেবকে সাহস করে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না।

পঞ্চগ্রাম পেরিয়ে চকচকে একটা সড়ক সিধে চলে গেছে। রাজারামের গুম্‌টি স্টিম-রোলারের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে—মহাদেবপুর ছাড়িয়ে। কিন্তু তাতে কোনো আক্ষেপ নেই রাজারামের। সময় পেলে সেও চলে আসতে পারে মহাদেবপুরে। আসেও।

বোমা খেয়ে একটা বিরাট বাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছে ওই ইঁটের ভাঙা খোলাটা। ভেঙে কাৎ হয়ে আছে, সব ইঁট সরানো হয় নি। রাজারাম পাকা সড়কের উপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চোখের রোদ আড়াল করে দেখছিল। ইঁটের পাঁজার ওপাশ থেকে কারা যেন আসছে।

ঝাঁঝা রোদে সারা মাঠ থরথর করে কাঁপছে। এতদূর থেকে লোক চেনা যায় না। রাজারাম চোখের উপর থেকে হাত নামিয়ে পাকা সড়ক ধ'রে হাঁটা দিল।

ওই চলে যাচ্ছে একটা লোক, পায়ের সঙ্গেসঙ্গে বেঁটে একটা ছায়া টেনে টেনে। গাছের ছায়ার নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে এবার।

পদ্মা থেকে চান্ সেরে রামেশ্বররা ফিরছে— সুখদা লবঙ্গ মানিক এলাচ আর রামেশ্বর।

রামেশ্বর বলল, ওই যে লোকটা যাচ্ছে, আসলে হয়তো ও ফকির, কিন্তু ওর নাম রাজা। কাজ্‌রি গান গায় বড় ভালো।

মানিক বাবার হাত ধরে বলল, কোথায় শুনলে বাবা?

—কৌশিকের দাওয়ায়।

এলাচ বলল, কি করে ও?

—কুলি খাটায়। এ রাস্তা তো ওরই তৈরি।

মানিক বলল, রাস্তা বানায় তো গান করে কখন?

রামেশ্বর হেসে বলল, তোর মা ঢেঁকি পাড় দেয় বলে কি ঘর নিকোবার সময় পায় না, পূজোপার্ব্বণে আলপনা আঁকে না?

সুখদা এগিয়ে হাঁটছিল। কথাটা কানে যেতেই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, খুব বুঝল তোমার ছেলে।

মানিক বলল, আমিও শুনব একদিন।

লবঙ্গ মানিকের হাত ধ'রে টেনে বলল, পা পুড়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি আয়।

সপরিবারে রামেশ্বর তার বাড়ির দিকে চলে গেল। তার পিছনে আকাশের গায়ে বিরাট একটা ক্ষতের মত আধভাঙা ইটের পাঁজাটা খণ্ড খণ্ড কয়েকটা মেঘকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল একা। আর পড়ে

রইল একটা চওড়া সড়ক। যদি কখনো কেউ আসে এ দিকে তারই জন্যে স্তব্ধ প্রতীক্ষার মত দেখাচ্ছে এই রাজপথটা।

প্রকাণ্ড একটা গদার মত মস্ত একটা লাউ ঝুলছে রামেশ্বরের খিড়কি দরজার পাশে মাচায়। ছোট ছোট আরও কয়েকটা লাউ দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরের খোলার চালে সাদা ধবধবে চালকুমড়ো দেখে মনে হচ্ছে সারা গায়ে চুন যেন লেপে দেওয়া হয়েছে। উঠোনে শিম গাছ, রকের গায়ে গায়ে কাঁচা লঙ্কার চারা। উঠোনের মাঝখানে ক্ষুদে গোলা একটা— এ-গোলায় ডাল আছে। ধানের গোলা খিড়কির ওপাশে, লাউয়ের মাচার গায়ে।

পশ্চিম উত্তর আর দক্ষিণ— তিনমুখো তিনটে করোগেট-টিনের ঘর, পুব-মুখো ঘরটা রান্নার। কৌশিক, কেশব আর রামেশ্বর— মহাদেবপুরের চাষী বলতে এরাই। নিজের হাতে কাজ তো করেই, তার উপর জন-মজুরও খাটাতে হয়। আর একজন আছেন এদের সঙ্গে-সঙ্গে, তিনি যোগেশ মহাপাত্র। বুদ্ধির দরকার হলে ডাক পড়ে মহাপাত্রের। মোটা লাঠি হাতে নিয়ে যোগেশ মহাপাত্র এসে হাজির হন। সম্মান তিনি পান সবার, সমীহ করে চলে সবাই। মহাপাত্র এ জন্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলেন, পনরটা বছর জেলে কাটিয়ে আর কিছু না-হোক, বুদ্ধিটা পাকিয়ে এনেছি। কি বল, কৌশিক?

কৌশিক কিছু বলে না। জেলের উপর তার আদপে শ্রদ্ধা নেই। দেশের কাজ করেই জেল হোক, আর জুয়াচুরি করেই জেল হোক— জেল তার কাছে জেলই। মহাপাত্রের মন-রক্ষার জন্যে আলগোছে সে একটু মাথা নাড়ে মাত্র। ওইটুকুই যথেষ্ট, এতেই যোগেশের খুশি ধরে না।

অল্পে খুশি হতে জানে মহাদেবপুরের বাসিন্দারা। তাদের চাহিদা খুব বড় নয়, তাদের অভাব তাই মারাত্মক নয় তেমন। যা তারা পায়, তাই তাদের খুব ; যা তারা পায় না, তা তাদের কাছে তেমন কিছু না। তাদের জীবনটা কাঁচা রাস্তার মত নিভৃতে ও নীরবে বয়ে যায় ; কখনো হয়তো ধুলো ওড়ে, কখনো কাদায় ভরে ওঠে। কিন্তু তাতে কোনো পরোয়াই নেই কারো— খরায় আর বর্ষায় পথঘাট সমান থাকে না, এটুকু তারা মেনে নিয়েছে। মহাদেবপুরের লম্বা জীবনের উপর দিয়ে অনেক খরা আর বর্ষা হয়ে গেছে, কিন্তু কখনো তা তাকে কাহিল করতে পারে নি। কিন্তু এই নিরীহ নম্র জীবনের মাঝখানে হঠাৎ এক সড়কের আবির্ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সবাই।

উদ্বেগটা যেন সবচেয়ে বেশি মহাপাত্রের, বলে, এবার বুকের উপর বাঁশ-গাড়ি। পনরটা বছর ঘানি টেনে শেষজীবনটা একটু আরামে কাটাব, তার উপায় রাখল না হতভাগারা। ভারি ভারি গাড়ি এনে হাজির করছে, ঘটর-ঘটর শব্দ লেগেই আছে রাতদিন।

কৌশিক একটু বিষণ্ণ হয়ে বলল, চিরটা কাল কি সমান কাটে কারো, না, কাটা ভালো? আঁধার আছে বলেই-না আলোর মহিমা!

—তাই। রামেশ্বর সায় দিল, বলল, রাত আছে বলেই-না দিনের এত কদর।

মহাপাত্র বিজ্ঞের মত বলল, রাতের মত রাত দেখ নি তোমরা, আঁধার কা'কে বলে তা জানো না তোমরা।

কেশব এসে বসল। হাতের লাঠি দাওয়ার গায়ে খাড়া করে রেখে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে বলল, সবার মন যে ভারি ভারি। খবর কি?

—এই, সড়কের কথা হচ্ছিল। নতুন সরকারি সড়ক।

—সে তো শেষ হয়ে গেল। পেল্লাই হাওয়াগাড়ি বনবাদাড় কাঁপিয়ে দুদ্দাড় করে ছুটোছুটি করছে। শব্দ পাও না এখান থেকে ?

যোগেশ মহাপাত্র ঘুরে বসল, কেশবের মুখ সে দেখতে পাচ্ছিল না। বলল, পাই বলেই তো কথা উঠল। বলি, মনে হচ্ছে কেমন ?

কেশব হেসে বলল, এঁদো ডোবায় পদ্মবন। চোখ ভরে দেখি, ভালোই লাগে দেখতে। নিজে ঠেঙিয়ে গিয়ে তো আর এ-জন্মে শহর দেখলেম না, তাই স্বয়ং শহরই দেখা দিতে এল। গাঁয়ের উন্নতি হবে এতে।

মহাপাত্র বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, উন্নতির আঁচটা পেলে কোথা থেকে শুনি ?

কেশব বলল, তক্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না, কিন্তু এতে গাঁয়ের চেহারা বদলাল। এইটে বড় ভালো লাগছে।

—মনের সুখের চেয়ে বাইরের জেল্লাটা বড় হল ? তবে আর কিছু না বললেম। কিষ্টপুরীতে তো নতুন ক্যাম্প বসল।

—বসুক, ভালোই তো। গাঁয়ের বাণিজ্যি বাড়বে। বলল রামেশ্বর।

মহাপাত্র আড়-চোখে একবার তাকাল রামেশ্বরের দিকে, কিছু মন্তব্য করল না। মনে-মনে হয়তো ভাবল, রামেশ্বরটা বড় লোভী।

দেখতে দেখতে দিন-কতকের মধ্যে সারা সড়কে সোরগোল পড়ে গেল। সড়কের ধারে ধারে বসে গেল স্টল। গাঁয়ের যেসব ছেলে ঘুড়ি আর চং উড়িয়ে মাঠে মাঠে দিন কাটাত, তারাই আগে এসে দোকান খুলল। এন্তার পয়সা পাচ্ছে তারা। ফেলা যাচ্ছে না কিছু, গাঁ থেকে কুড়িয়ে কাচিয়ে মুড়ি-মুড়কি চিড়ে-গুড় চম্‌চম্‌ খাজা-গজা যা-ই নিয়ে যাচ্ছে, পল্টনের দল গাড়ি থামিয়ে তা-ই কিনে নিচ্ছে দু হাতে।

সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে রামেশ্বর এই তামাশা দেখছিল। ভারি

আমোদ লাগছিল তার। ভাবছিল, মানিকটাকে দিয়ে খোলালে হয় একটা। কিন্তু না, অতটা নামতে পারবে না সে। ছেলেকে দিয়ে দোকান খোলানো চলবে না। বাড়ুক, গাঁয়ের বাণজ্যেই তার বাণিজ্য।

ও কে আসে? মহাপাত্তরদা না? রামেশ্বর কপালের উপর হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল। হাওয়ায় দাড়ি উড়ে কাঁধে উঠেছে, হাতে লাঠি, হাঁটুর উপর কাপড়, খালি পা—দৌড়তে দৌড়তে আসছে মহাপাত্র।

—এই যে রামেশ্বর, তোমাকে দেখেই ছুটে আসছি, কী আরম্ভ হল রামেশ্বর? ছেলেরা খেলা ভুলে গেল? ঘুড়ি চং ডাণ্ডাগুলি— কিছু ওদের আর টানছে না?

রামেশ্বর বলল, সারা জন্ম খেলে বেড়ালে কি চলবে, কত্তাদা?

—না খেলুক, শুয়ে গড়াক। এখান থেকে ওদের সরিয়ে নাও। এ কখনোই বাণিজ্য নয়, রামেশ্বর। এটা ভয়ংকর লোভ।

রামেশ্বর গা করল না। মহাপাত্তরদাকে সম্মান সমীহ করে তারা, কিন্তু পাগলও ভাবে। অযথা ক্ষেপেছে লোকটা, নয়কে হয় করে অকারণে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। এটা লোভ কিসের? এও ওদের খেলা। চং ঘুড়ি না উড়িয়ে, কিংকিং না খেলে ওরা এই নতুন খেলা খেলছে।

রামেশ্বর বলল, যুদ্ধের নতুন-কিছু খবর আছে নাকি? এত পল্টন আসছে কেন?

—জানি নে। হয়তো নতুন করে আবার বাধল কোথাও। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছ, রামেশ্বরভায়া, বড় ভুল বুঝেছ তোমরা। কারা-সব ঢুকছে গাঁয়ে, দেখছ?

—কারা? রামেশ্বর রাস্তাটার দুই দিকে তাকাল।

আর-কিছু না বলে যোগেশ মহাপাত্র হাঁটা দিল।

—কোথায় চললেন ?

—ঘুরে আসি।

যে বেগে তিনি এসেছিলেন, সেই বেগেই আবার চলে গেলেন। রামেশ্বর মনে মনে হাসল, সত্যি, লোকটা বদ্ধ পাগল। চুলোর দুয়োরে যার কেউ নেই তার এত উদ্বেগ কেন ? ছটফট করে ঘুরে বেড়ানোটাই বুঝি এখন ওঁর নতুন কাজ হয়েছে। এতদিন ফাটক খাটলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে ? তার হাড়-গোড় মাথা-মগজ নিংড়ে রস-কষ সব বের হয়ে যায়। মহাপাত্রের জন্যে দুঃখ হয় না যে তাদের, তা নয়। কেশবও তো সেদিন কত দুঃখ করছিল। এক-মাথা চুল, এক-মুখ দাড়ি —এ রকম পাগল সেজে থেকে লোকটার যে কী লাভ হচ্ছে বুঝে পাওয়া কঠিন। মহাপাত্রের উপর তাদের যে-রাগ হয় সে-রাগে ঝাঁজ অবশ্য নেই একটুও, সে-রাগটা মহাপাত্রের উপর তাদের স্নেহেরই তাপ।— একদিন নিরিবিলিতে বসে বোঝাতে হবে ওঁকে।

রামেশ্বর বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

সুখদা রোদে পিঠ দিয়ে বড়ি দিচ্ছিল, লবঙ্গ খাঁচায় খাবা দিয়ে খেলা করছিল টুনটুনির সঙ্গে, বলছিল টুনটুনি রে টুনটুনি—

ময়না জবাব দিচ্ছিল, মনের কথা বলবি নি ?

—দূর ফাজিল, ফক্কড় ! মনের আবার কথা কী রে ?

ময়না উত্তর দিল, মনের আমার কথাটি রে।

লবঙ্গ বলল, শুনছ মা, তোমার ময়না উড়িয়ে দাও। পষ্ট করে কথা বলতেই শিখল না এতদিনে।

সুখদা জবাব দিল না। পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাতেই দেখে রামেশ্বর।

রামেশ্বর বলল, মহাপাত্তরদার মাথাটা আরো বিগড়েছে। বলে, দোকান-পাট থেকে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুখদা ডাল-বাটা ফ্যাঁটাচ্ছিল, হাত থামিয়ে বলল, কার দোকান, কিসের দোকান?

—ওই যে গো, সড়কের ধারে সব দোকান দিয়েছে-না?

—তোমার ছেলেও দোকান দিয়েছে নাকি?—তবে? তবে তোমাকে সরাতে বলেন কেন?

রামেশ্বর বারান্দায় উঠে এল, বলল, তাই তো বলি, মাথাই বিগড়েছে।

সেইদিন বিকেলে মহাপাত্র হাজির। খিড়কির দরজার ওপাশ থেকে চীৎকার করে ডাকছেন রামেশ্বরকে।

রামেশ্বর ছুটে বাইরে যেতেই বললেন, ছ্যাখো, নতুন একটা লোক ধরে নিয়ে এসেছি।

রামেশ্বর নতুন লোকটার দিকে ভালো করে চাইল। তার কাছে এ তো নতুন নয়। কৌশিকের ওখানে এর আগে একদিন একে দেখেছে রামেশ্বর।

—কি হে, তাজ্জব হয়ে গেলে কেন? অমন করে তাকাচ্ছ?

রামেশ্বর দ্বিধা করছিল, বলল, ভিতরে রোয়াকে গিয়ে বসাবেন?

—ক্ষতি কি? নিয়ে চল। দেখলাম, এও আমারই মত পাগল। চারদিকে দৌড়-ঝাঁপ, হুটোপাটি, ট্যাঙ্ক আর ট্রাক, তারই মাঝ থেকে দিব্যি সটকে গিয়ে পদ্মার ধারে বসে গলা ছেড়ে গান করছে। গান শুনেই তরতর করে নেমে গিয়ে গ্যাঁক করে ধরলাম।

চাটাই পেতে দিল মানিক। তিন জনে বসল।

মহাপাত্র বলল, আমাদের বাত-চিত মালুম হচ্ছে তো? বুঝতে নিশ্চয় বহুৎ অসুবিস্তা হচ্ছে না।

রাজারাম ভাঙা-ভাঙা কথায় জানাল, সে বুঝতে শিখে নিয়েছে সব কথা। এখনও ঠিকঠিক মত বলতে পারে না, আর কিছু দিন গেলেই বলতেও শিখে নেবে বলে তার ভরসা আছে।

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মহাপাত্র বলল, বহুৎ আচ্ছা। এই তো নওজোয়ান কি বাৎ।

রামেশ্বরের দিকে চেয়ে মহাপাত্র বলল, তোমার এখানে একে টেনে নিয়ে এলাম কেন জানো? আমি তোমাকে যা বলি, এ-ও আমাকে ঠিকঠিক তাই বলল। বলল, এসব দোকান-পাট তুলে দেওয়া দরকার। এ-সড়কটা বানিয়েছে এ, কিন্তু তবু এ বলছে— এ কালো সড়ক সড়ক নয়, এ হচ্ছে কাল-কেউটে।

রাজারাম মুচকি হেসে মাথা নাড়ল, কথা সব যে সে বুঝতে পেরেছে তা মহাপাত্রকে জানান্ দিল।

রামেশ্বর বলল, আমি একে দেখেছি এর আগে। গত শাওনে কৌশিকের ওখানে কাজরি গান গেয়েছিল।

—বটে! আমি ভাবলাম, আমি ডিস্কভার করলাম, তোমরা তার আগেই ইনভেণ্ট করে বসে আছ?

নিজের রসিকতাতে নিজেই হাসলেন মহাপাত্র। তাঁর এ-রসিকতার অর্থও অবশ্য এরা দু জন বিন্দু-বিসর্গ বুঝল না, কিন্তু তাতে কী আসে-যায়, মহাপাত্র হাসতেই লাগলেন।

রামেশ্বর বলল, দেশ কোথায়? মুলুক?

জবাব দিলেন মহাপাত্র, বললেন, সুচেত্পুর, পাঞ্জাব।

রামেশ্বর সরলভাবে বলল, মনেই হয় না, তাই-না যোগেশদা?

দেখতে-শুনতে প্রায় আমাদেরই মত। মনে হয় বাংলারই লোক।

মহাপাত্র দাড়ি-সমেত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, মানতে রাজি না, দেখতে-শুনতে তোমার থেকে অনেক ভালো।—বলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল রামেশ্বর।

কাঠায় করে মুড়ি-গুড় নিয়ে এল মানিক। রাজারাম কাঠার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বড় ভালো লাগছে তার। এত ছোট ধামা একদিন তার চোখে পড়ে নি। ঠিক খেলনার মত দেখতে।

মহাপাত্র আদেশ করলেন, হাত লাগাও। বাংলাদেশের মুড়ি জগৎ-বিখ্যাত, জানো তো? এ হচ্ছে আমাদের দেশের বিস্কুট—আচার্য রায়ের নাম শুনেছ?—শোনো নি। তিনি একজন মস্ত লোক ছিলেন, তিনিই একথা বলেছেন।

সংকোচ বোধ করছিল রাজারাম। সে সামান্য এক আহির, লেখা-পড়া শেখা যাকে বলে, তা সে শেখে নি; মহাপাত্র তাকে এত বড়বড় কথা বলছেন যার এক বর্ণও যে বুঝতে পারছে না— তা হয়তো তিনি জানেন না।

মাথা নীচু করে খাচ্ছিল রাজারাম, চোখ তুলে তাকাতেই সে চমকে উঠল। উঠোন ডিঙিয়ে চলে গেল কে ও?

—বেজায় মিষ্টি। মন্তব্য করলেন মহাপাত্র।

রাজারাম থতমত খেয়ে তাকাল মহাপাত্রের দিকে, গুড়ের টুকরোয় কামড় দিয়ে তিনি বললেন, আমি আবার বেশি মিষ্টি পছন্দ করি নে।

রামেশ্বর বলল, লবঙ্গ তা জানে। তাই, দেখছেন-না, আপনাকে কম করেই দিয়েছে।

এদের কথায় আর কান গেল না রাজারামের। নামটা সে মনের মধ্যে যেন গেঁথে নিল। তার মনে ফিরে এল সেই নিঃসঙ্গ গুম্‌টি। আর মাথা তুলে সে তাকাল না। পরনে কি আছে, নাকেই-বা আছে কি, তা স্পষ্ট সে দেখতে পায় নি এখন, কিন্তু হাতের রুপোর বালা তার চোখে পড়েছে।

মহাপাত্র মুড়ি চিবতে-চিবতে বললেন, আমাদের গাঁ কেমন লাগছে, রাজারামবাবু? তোমাদের পাঞ্জাবে আমি গিয়েছিলাম একবার। তখন বয়স ছিল কাঁচা, মনটাও ছিল কচি—

রাজারাম পাল্টা প্রশ্ন করল, বলল, কেমন লাগল পাঞ্জাব?

—দেশ তো দেখি নি। আমি তখন ছিলেম ফাটকে আটক। বক্সা ক্যাম্প থেকে টানা চলে গেলাম লাহোর। মহাপাত্র হাসলেন, বললেন, পরদানশিন মেয়েদের মত প্রায় ঘোমটা-ঢাকা হয়ে বাংলা বিহার পেরিয়ে চলে গেলাম।

রাজারাম কিছু বুঝল না, মহাপাত্রের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

রামেশ্বর বুঝিয়ে দিল, বলল, স্বদেশী ডাকাত ছিলেন।

—ছিলেন কি হে রামেশ্বর, প্রতিবাদ করে উঠলেন মহাপাত্র, এখনো আছি। আমি কি ফুরিয়ে গেছি না কি হে? রোজ দু বেলা দেখতে পাচ্ছ না আমাকে? ডাকাতি করি নে বলেই কি আর ডাকাত নই?

চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠল মহাপাত্রের, আর গাল আর মাথা ভরতি চুলের অরণ্য ভেদ করে দাবানলের মত জ্বলতে লাগল গনগনে দুটো চোখ।

একদৃষ্টে চেয়ে ছিল রাজারাম। মাঠ ঘাট বন-বাদাড় নদীনালা গ্রাম-নগর পেরিয়ে কত দূর থেকে সে এসেছে এই অজানা ও অচেনা

দেশে। এখানে এসেও সে সত্যিকারের মানুষের গলা শুনতে পেল যেন। লাহিড়ি-ইস্পাহানি কোম্পানির কুলির সর্দার সে, সে নগণ্য ও তুচ্ছ। শান্তনু লাহিড়ি তাকে কী চোখে দেখে তা সে জানে। সেই রাজারামকে নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল এই লোকটা। কে এই লোক? প্রথমে সে একটু বিব্রত না হয়েছিল, এমন না, বিরক্তও হয়েছিল হয়তো সামান্য। কিন্তু তবু সে তাঁর সঙ্গেসঙ্গে এল কেবল কৌতূহলে, তামাশা উপভোগ করার জন্যে। প্রথম থেকেই লোকটাকে তার পাগল বলে ঠেকেছে।

মহাপাত্র তার মন ভুলিয়ে দিল নাকি? একটু আগে উঠোন ডিঙিয়ে চলে গেল যে, সে কি তার মন থেকে উহ্য হয়ে গেল ইতিমধ্যে?

মহাপাত্র বললেন, কচি মনে একবার যে দাগ পড়ে তা কি কখনো মুছে যায়, রামেশ্বর?

চমকে উঠল রাজারাম, তার আঁতের কথা এমন চটচট করে বলে উঠছে কেন এ?

মহাপাত্র বলল, আমি আজও ডাকাত, কালও ডাকাত, পরশুও ডাকাত।

রামেশ্বর লজ্জিত হয়ে উঠল, সসম্ভ্রমে বলল, তা তো ঠিকই কর্তা-মশায়। ভালোবাসার মত ভালোবেসে ফেললে—

—বুঝেছ তাহলে, উঠে দাঁড়ালেন মহাপাত্র, রাজারামকে ডেকে বললেন, এস রাজারামবাবু, তোমার ডেরা দেখে আসি।

রক থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এল। একবার ফিরে চাইবার ইচ্ছে হল রাজারামের, কিন্তু তার সারা মন ফিরে রইল, কিন্তু ঘাড় কিছুতেই সে ফেরাতে পারল না।

রোদ গিয়ে ঠেকেছে গাছের আগায়। কে ডাকে ও? একটানা

একস্বরে পাখিটা কি বলে ? কান খাড়া করেও রাজারাম ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

একটু থমকে থেমে রাজারাম বলল, আমার ডেরা দেখবেন ? সে এখান থেকে অনেক দূর ?

—কোথায় থাকা হয় ?

—ধানকোড়া।

মহাপাত্র বললেন, সে আর কতদূর ? গল্প করতে করতে হেঁটে চলে যাব।

রাজারামের মধ্যে কী পেলেন মহাপাত্র বলা শক্ত। গান তিনি পছন্দ করেন, এমন কথা গাঁয়ের কোনো লোক কোনো দিন শোনে নি ; এমন-কি মহাপাত্র নিজেও তা বুঝি জানতেন না। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন তাঁর গানের উপর এ টান হল ? নদীর ধারে শিবালয়—ছোট একটা মন্দির। প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। গাঁয়ের লোক হাসাহাসি ক'রে বলাবলি করে, মহাপাত্র মহাদেব হয়ে যাবেন, তাই ওখানে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেন। আজও তিনি গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসেও ছিলেন, হঠাৎ তাঁর কানে একটা স্বর ভেসে এল— 'মঙ্গলমন্দির খোল দয়াময় মঙ্গলমন্দির খোল'। দ্বারহীন উন্মুক্ত এই মন্দির, সেখানে চোখ বুজে তিনি এই স্বর শুনলেন। তাঁর চোখের পাতা খুলে গেল। দেখলেন, অদূরে নদীর ঢালুতে বালুর উপর গা ছেড়ে বসে আছে কে যেন।

কাঁচা রাস্তা পার হয়ে তারা নতুন সড়কে এসে পড়ল। এখানে-ওখানে ছড়ানো দু-চারটে স্টল। অনেক দূর থেকে একটা হল্লা এসে তাদের কানে পৌঁছল, একটু থমকে থেমে আবার হাঁটতে শুরু করল দু জন। কালো কম্বলের মত ভারি অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে

মহাদেবপুরের প্রান্তরে। তারা এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে তারা এই আনকোরা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পথের স্টলে স্টলে কেরোসিনের কুপি জ্বলে উঠেছে, নতুন সড়কের দু ধারে সার সার আলোর মেলা যেন বসে গেছে। সেই গেঁয়ো আলোকে ঠাট্টা ক'রে আকাশের তারা জ্বলে উঠল মিটমিটিয়ে। তীব্র হেডলাইটে সারা গাঁ আলোয় নাইয়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল একটা ভারি ট্রাক।

কিষ্টপুরীর ক্যাম্পে এখন বিজলি বাতি জ্বলছে। টাইগার সাহেব বাঘের মত দাপাচ্ছেন হয়তো তার চত্বরে।

ধীরে ধীরে জমে উঠল আসর। প্রথমে মনে হয়েছিল, এ পথটা ফালতু— না হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ফালতু এ নয়, এ পথ না হলে চলতই না। এত সেপাই এত লস্কর একটা যুদ্ধে লাগে, এমন ধারণাই করা যায় নি আগে। মাঠে মাঠে তাঁবু পড়ে গেল, মাঠের টাটের উপর যেন নৈবেদ্যের সার।

জীপ-গাড়িতে চেপে টাইগার সাহেব রোঁদে বার হন। খবর চালু হওয়া মাত্র সেপাইদের মধ্যে ডিসিপ্লিন এসে যায়, গ্রামের ছেলেদের মধ্যে পড়ে যায় সাড়া; জীর্ণ স্টল ছিমছাম করে তোলার চেষ্টা করে তারা। বলা যায় না, এক চুল এদিক ওদিক হয়ে গেলে স্টল ভেঙে তছনছ করে দিতে কতক্ষণ। তাঁর মেজাজ নিয়ে অনেক কেচ্ছা তো ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে।

আকাশে চং উড়ছে না, চিলের মত শূন্যে পাক খাচ্ছে না ঘুড়ি। বাতার বেড়ায় লাটাইএর বাঁট গোঁজা হয়ে পড়ে আছে সব ঘরেই, তেতুল-বীচির আঠা দিয়ে মাঞ্জা করা সুতোর ধার ব্যর্থ হয়ে গেছে একেবারে।

টাইগার নাকি পাজির পা-ঝাড়া। এর আগে ও নাকি ছিল

রাঙামাটিতে। লোকটা পাজি হলে হবে কি, খুব লক্ষ্মীমন্ত লোক। সে আসা অবধি এই মহাদেবপুরের হালচালই বদলে গেছে। এক-হাঁটু ধুলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে গোরু খেদাত, তারাও আজকাল অ্যালবার্ট টেরি কেটে শিস্ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশে উড়ত কাগজের ঘুড়ি, সেই কাগজ এখন হয়ে গেছে টাকা। পকেটে পকেটে নোটের বাণ্ডিল সকলের।

রামেশ্বররা খুব খুশি, সত্যিই গাঁয়ের বাণিজ্য বেড়ে গেছে ধাঁ ধাঁ করে। চমচম খিরপুরী খাস্তাগজা জোগান দিয়ে পেরে ওঠাই দায়। স্টলে আসা মাত্র লুফে নিয়ে যাচ্ছে সেপাইরা।

—খির-ছানায় ময়দা ঠাসো, নইলে পেরে উঠবে কেন। অত ছানা অত খির পাবে কোথায় ?

হ্যাঁ, বুদ্ধি বটে নিতাই পোদ্দারের। পোদ্দার আগে করত তেজারতি, এখন ডিমের চালান দেয়। বিশ-পঁচিশটা গাঁয়ের হাঁস ডিম পেড়ে পেড়েও পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না পোদ্দারের সঙ্গে ; হাঁসের হাতে নোট গুঁজে দিলে যদি তারা খুশি হয়ে আরো কটা বেশি করে ডিম দিত তাহলেও পোদ্দার তাতে রাজি ছিল। কিন্তু পাতি আর বেলে হাঁসেরা টাকার দাম বুঝল না, পোদ্দারের এ বড় আক্ষেপ।

হাত ভরে ভরে খিরপুলী খাচ্ছে কয়েকটা কাফ্রি সেপাই। কঙ্গো-নদীর দেশ থেকে পদ্মানদীর দেশে এসে তারা মুখ মিষ্টি করার লোভ সামলাতে পারে নি। জীবনপণ করে তারা লড়াই করে কখন, তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু খাওয়ার ঢং দেখে মনে হয় জীবনসংশয় করে খেতে জানে ওরা। মুখ বরাবর টাটকা নোট ফেলে দিয়ে খাবার কিনে নিচ্ছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল মহাপাত্র। অটল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল সে। তার বাল্যের, তার স্বপ্নের মহাদেবপুর নিমেষে নিমেষে নতুন রূপে বদল হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। একে রুখবে এমন সাধ্য তার কোথায়; একে ঠেকাবে এমন শক্তি তার কই। সারাটা পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে লোক খুঁটেখুঁটে এনে এই মহাদেবপুরের প্রান্তরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে আছে সে, চারদিকের এত জাঁকের মধ্যে উহ্য হয়ে গেছে মহাপাত্র। এক-নজর চেয়ে কেউ দেখছেও না তাকে।

নদীর কিনারে শিবালয়টা পড়ে আছে শ্মশানের মত। ও-পথ কেউ আর বড়-একটা মাড়ায় না। নদীতে যারা নাইতে যেত, তারা ছেকলে ঝোলানো ঘণ্টাটা একটু নেড়ে দিত, আর সেই টুংটুং শব্দটা থেমে যাওয়ার আগেই কাপড় নিংড়ানো জল দিয়ে চন্দন ঘষে কপালে ফোঁটা কাটত। গাঁয়ের মেয়েরা তো এখন ঘরে ঘরে বন্দী, পুরুষরা স্টলে-স্টলে। এ পথে তাই আর আসা ঘটে ওঠে না। মহাপাত্র কিন্তু আসে, কিন্তু সে আসা তো নির্ঘটা আর নিরিবিলি। ঘণ্টায় হাতও দেয় না সে। ছেকলে হয়তো এতদিনে জং ধরে গেছে।

মধুমালা এক ছুটে রামেশ্বরের উঠোনে ঢুকে পড়ল, বলল, কই রে, লবঙ্গ কই?

সুখদা বাটনা বাটছিলেন, রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চেয়ে বললেন, মালা নাকি রে?

—হ্যাঁ কাকিমা, নাইতে এলাম। এ এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে। শাড়ি-গামছা দাওয়ার উপর রাখল মধুমালা।

—ঝঞ্ঝাট আবার কি?

—পথে বেরনো।

মধুমালার গলা পেয়ে লবঙ্গ খাঁচা-হাতে দক্ষিণদুয়ারী ঘরের পিছনের কুয়োতলা থেকে বেরিয়ে এল, বলল, এসেছিস্ ?

খিলখিল করে হেসে উঠল মালা, বলল, টেনে নিয়ে গিয়েছিল প্রায়। ছুটে পালিয়ে এলাম। মোষের মত কালো চারটে সেপাই হল্লা করতে করতে শেতলা-তলা দিয়ে আসছিল। আমি ওদের দেখেই এক ছুট।

লবঙ্গ একটু মুচকে হাসল মাত্র, বলল, আমার টুনটুনির নাওয়া হল। এবার আমিও নাইব।

উঠোন থেকে রকে উঠবার জন্যে তালগাছের গুঁড়ি পাতা, তার উপর পা দিয়ে লবঙ্গ চালের সঙ্গে খাঁচা লটকাতে লটকাতে টুনটুনিকে ডেকে বলল, নাওয়া হল মহারাজের ?

পাখা ঝাপটে পালকের জল ঝেড়ে টুনটুনি জানাল, তার নাওয়া হয়েছে।

লবঙ্গ বলল, টুনটুনি রে টুনটুনি, নতুন কিছু বল্ শুনি।

ময়না বলল, পল্টন লস্কর সব্বাই ঘুষখোর।

মালা আবার হাসল খিলখিল করে, বলল, কি বলে ও ? এসব কী শেখাচ্ছিস।

ঘর থেকে গামছা নিয়ে লবঙ্গরা চানে গেল। কাঁঠাল-গাছের নিবিড় ছায়া দিয়ে ঝেঁপে ধরা কুয়োতলা। বালতি বালতি জল তুলে হড়হড় করে ঢেলে স্নান করছে দু জন। গায়ে ঠাণ্ডা জল পড়ে তাদের প্রাণে যেন ফুর্তি এসে গেছে।

আড়চোখে চেয়ে মালা বলল, দিন দিন যা হচ্ছিস তুই !

—কি হলাম আবার।

—নিজের অঙ্গের দিকে একবার চেয়ে দেখো। ছোট আয়নায় ও-গতর সবটা কি ধরবে ? এই জলের গামলায় ছায়া ফেলে দেখো না

একবার। মালা লবঙ্গর পিঠে চিম্‌টি কাটল, বলল, বর পাবি কোথায় লক্ষ্মীছাড়ী।

লবঙ্গ হেসে বলল, জুটিয়ে নিতে হবে একটা।

—এ মুল্লুকে নয়। হেথায় তোমার জুড়ি পাবে কোথায় ভাই ?

—যেথায় জোটে সেথা থেকেই তবে আনতে হবে। লবঙ্গ পিঠের দিকে চুল ছড়িয়ে দু হাতে গামছা ধরে ফটফট করে ঝাড়ছিল।

মালা লবঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, অমন ভঙ্গি করে দাঁড়াসনে। ভাগ্যিস আমি মেয়েমানুষ, নইলে এখনি যা-তা কাণ্ড হয়ে যেতে পারত।

—তুই কিন্তু ভারি ফক্কড় হচ্ছিস, মালা। কৌশিককাকাকে বলে দিতেই হচ্ছে।

মালা বলল, বাবা জানেন তাঁর মেয়ের বয়েস হচ্ছে।

লবঙ্গ ঝামটা দিয়ে বলল, বয়েস হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছ। বয়েস হলেই বেয়াড়া হতে হবে, তাই না ? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি, ওই মোযেদের হাতেই তুলে দেব তোকে।

মালা এক বালতি জল টেনে তুলে বলল, তবে বলি শোন্‌। কাউকে বলবি নে বল্‌ ? একজনকে আমার কিন্তু— চোখ ইশারা করে বাকিটা সে বুঝিয়ে দিল।

—কে সে ? লবঙ্গ একটু কাছে সরে এসে বলল, জানি জানি।

—বল্‌ তো।

—নিতাই পোদ্দারের মেজছেলে বিপিন।

অযথা এক-গাল জল নিয়ে কুলকুচি করে মালা বলল, মোটেও না। অনেকে একথা বলে বটে, কিন্তু সেকথা স্রেফ বাজে।

ভিজে কাপড়ের উপর শুকনো কাপড়ের ঘের দিয়ে লবঙ্গ একটু হাসল, বলল, তবে ভাই জানি নে। জানতেও চাই নে।

—জানি জানি মনটা করে, পেটে খিদে মুখে লাজ। মধুমালা ভু চোখে মধুর ভঙ্গি করে বলল, যদি বলি তার নাম রাজা।

কাপড় ছাড়া হয়ে গেছে লবঙ্গর, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মালার চোখে চোখ দিয়ে চেয়ে বলল, সে আবার কে ?

—চিনবি নে। সে এক বিদেশী রাজা।

লবঙ্গ একটুখানি কী যেন ভাবল, বলল, ঠিক বুঝলাম না।

মালা খিলখিল করে হেসে বলল, একেই বলে ধাঁধা।

—ইশ্, মস্ত ধাঁধা। নাম ভেঙে আধখানা করে বললে চট করে চিনব কেমন করে ? রাজারাম বল্।

আকাশ থেকে পড়ল মধুমালা, বলল, তুই চিনলি কেমন করে !

—যেমন করে তুই চিনলি।

—শাওন মাসে আমাদের দাওয়ায় বসে কাজ্রি গাইল, চিনব না ?

লবঙ্গ ঠিক তেমনি স্বরে বলল, অঘ্রান মাসে আমাদের দাওয়ায় বসে মুড়ি চিবিয়ে গেল, আমিই-বা চিনব না কেন ?

মধুমালার একটা গোপন ঐশ্বর্য আচম্কা যেন বারোয়ারি হয়ে গেছে, এমনি একটা আতঙ্কের চোখে তাকাল, দম নিয়ে বলল, কিন্তু মানায় ওকে তোর সঙ্গেই, তোর জুড়ি খুঁজছিলাম—এর কথা তখন মনেই হয় নি।

—কাজ নেই মানিয়ে।

ওদিক থেকে ময়নার গলা পাওয়া গেল, পল্টন লস্কর—

লবঙ্গ উঁচুগলায় সাড়া দিয়ে বলল, যাচ্ছি।

সেদিন বিকেলে মধুমালা আবার এল। কপালে কাঁচপোকার টিপ, খোঁপায় প্রজাপতি বসানো জাল, পরনে কস্তা-পেড়ে কোড়া শাড়ি ; চোখে আজ কাজল এঁকেছে মধুমালা।

লবঙ্গ বলল, এত সাজের ঘটা কেন রে।

—সাজ আবার কই? মধুমালা নিজের গায়ের আর পায়ের দিকে চেয়ে বলল, সাজবি এখন তোরা। তোদের অঙ্গনে নিত্যি নব রসিয়ারা আসছে।

ইঙ্গিতটা ভালো না। লবঙ্গ হয়তো একটু বিরক্ত হল। এবার রথের মেলায় বাইনাজুড়ি থেকে পালা-কীর্তনের দল এসেছিল, সেই গান শোনা এস্তোক মালা তার থেকে দু-চারটা কলি বসিয়ে কথা কইতে শুরু করেছে। আজও সে তাই বলল। কিন্তু লবঙ্গর কানে বড় বিশ্রী শোনাল কথাটা। একটু চুপ করে থেকে বলল, তার খোঁজে এসেছিস বুঝি? নিত্যি আসে না ভাই, একদিন এসেছিল।

মালা বলল, অত সস্তা মেয়ে ভাবিস নে আমাকে। একদিন দূর থেকে তাকে দেখেছিলাম। দেখতে ভালো লাগল, বললাম, ব্যাস্।

লবঙ্গ হেসে ফেলল, বলল, তোকে দোষ দিচ্ছে কে? ভালো লাগলে বলতেই হয়।

মালা নিশ্বাস ফেলে বলল, অত উপদেশ দিতে হবে না। আমি পেট-পাতলা, তাই আঁতের কথা বলে ফেলি। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ আমার নাই।

লবঙ্গ আবার হাসল, আমরা কিন্তু কিচ্ছু বলি নে! সব মনের মধ্যে পুষে রাখি।

মানিক ফিরল। কিংকিং খেলার সঙ্গী পায়‌না, তাই। একা-একাই লাট্টু ঘোরাচ্ছিল। হাতে-পায়ে ধুলো মাখা। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, আরো দু গাড়ি সেপাই এল আজ। হল্লা করতে করতে মানিক-গঞ্জের দিকে গেল দেখলাম।

দিন ছোট। গাছের মাথায় রোদ ছিল একটু আগে, দেখতে-দেখতে

হঠাৎ চারদিক আবছা অন্ধকারে ছেয়ে এল। মধুমালা রকে পা ঝুলিয়ে বসে কি-যেন ভাবছে। সে পা দোলাচ্ছে। এতক্ষণ দেখে নি লবঙ্গ, আবছা আলোতেও দেখা গেল, দু পা তার আল্‌তা-রাঙা।

—কোড়া কাপড় পরেছিস কেন? লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করল।

—যার যা আছে। শূন্যে চোখ রেখে মধুমালা জবাব দিল, কেউ পরে খড়কে-ডুরে, কেউ পরে লাল-পেড়ে।

—অমন বাঁকা করে কথা বলছিস কেন?

সুখদা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, ঘরে ঘরে বাতি দেখা। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। এটা কি গল্পের সময়, লবঙ্গ? মালা, একা যেয়ো না, মানিক দিয়ে আসবে।

লবঙ্গ বাতি দেখাতে উঠে গেল।

মালা বলল, অত ভয় করতে গেলে গাঁয়ে আর বাস করতে হবে না। একাই আমি চলে যেতে পারব। এইটুকু তো রাস্তা।

—তা হোক, মানিককে সঙ্গে নিয়ো। উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণদুয়ারী ঘরে চলে গেলেন সুখদা।

মালা গেল না। বসে রইল চুপচাপ। লবঙ্গকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার তার বড় ইচ্ছে। সেই কথাটার জন্যে সে যেতেও পারছে না। তার শুধু জানার ইচ্ছে, সেই লোকটাকে লবঙ্গ চেনে কতটা, লবঙ্গ তার নাম জানল কী করে?

—একটা নতুন লোক এল, বসল, তার নাম জানা কি এতই আশ্চর্য?

এর পর মালা আর বসল না। লণ্ঠনের চিমনি ঠিক-মত বসে নি, তাই পলতের কোণ দিয়ে আলোটা বেঁকে চিমনির গায়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল। মানিক ঘরের মধ্যে বসে চিমনি ঠিক করে বসাবার চেষ্টা

করছে। এই সুযোগে মালা কাউকে কিছু না বলে কখন চলে গেছে কেউ জানে না।

—রামেশ্বর ঘরে আছ ?

চেনা গলা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লবঙ্গ বলল, বাবা তো নেই। কেশবকাকার বাড়ি গেছেন তামুক খেতে।

মহাপাত্র। অকারণেই রামেশ্বরের খোঁজে এসেছিলেন হয়তো। অত বড় একটা প'ড়ো বাড়িতে একা থাকতে থাকতে বোধ হয় হাঁফ ধরে ; দম নেবার জন্যে একবার রোজ তাই আসেন তিনি। রামেশ্বর ঘরে নেই শুনেই মহাপাত্র চলে যাচ্ছিলেন।

লবঙ্গ বলল, বসবেন না ?

মালা তার মনে কী রং ধরিয়ে দিয়ে গেছে। যা কখনো সে ভাবে নি, সেই কথাই সে এখন ভাবল। সত্যিই কি তার সঙ্গে মানায় লোকটাকে ? লবঙ্গ একটু উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল মহাপাত্রের সঙ্গে আর কেউ এসেছে কি না। না, কেউ আসে নি। লবঙ্গর কথার কোনো জবাব না দিয়ে মহাপাত্র ওই চলে যাচ্ছেন একা একা।

লাঠিটা হাতে বাগিয়ে ধ'রে মাহাপাত্র হন্‌হন করে হাঁটছেন। চারদিকে কুয়াশার স্তর নেমেছে ঘন হয়ে। অন্ধকারে কুয়াশা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে আলগা একটা হিম গিয়ে যে বুকের মধ্যে ঢুকছে তা বুঝতে পারছেন মহাপাত্র। দূরে ওই গাছের আড়াল দিয়ে কৌশিকের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে লালচে রঙের। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে মহাপাত্র হেঁটে চলেছেন সড়কের দিকে। কৌশিকের বাড়ির গা দিয়ে তিনি হেঁটে চললেন, হঠাৎ থমকে থেমে বললেন, কে এখানে ?

বিপিন থতমত খেয়ে গেল, বলল, আমি বিপিন। কোথায় চললেন, জ্যাঠামশাই ?

মহাপাত্র কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। একটু বাদেই তিনি এসে দাঁড়ালেন চক্‌চকে চওড়া সড়কের ধারে। গভীর অন্ধকার ভেদ করে আলোর রাজ্যে এসে গেলেন মহাপাত্র। ওই স্টলের সার। মহাপাত্র তো এত চঞ্চল-প্রকৃতির নন, কিন্তু তাঁর ভিতরটা এত ছটফট করছে কেন? তিনি নিজেই এ কথার জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না যেন।

গলায় তিনি জড়িয়ে নিলেন চাদরের কোণ, আধখামা ঘোমটার মত করে মাথার উপর দিয়ে আলোয়ান টেনে নিলেন। পিছন পিছন আসছে কারা? অত শিস্ দিচ্ছে কেন? মহাপাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনটে সেপাই তাঁর কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে তাঁকে কেন-যেন দেখল। তার পর হো হো শব্দ করে হেসে উঠল তারা। তাদের ভুল হয়েছিল। অন্ধকারে ঘোম্‌টা দেখে তারা ভুল করেছিল। মহাপাত্র তা বুঝতে পারলেন, হাতের লাঠি তাঁর হাতেই রইল। তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন, এমনি অনড় ও নির্বিকার ভাবে তিনি চেয়ে রইলেন ওদের দিকে।

চীৎকারে নিস্তব্ধ পল্লীটা উচ্চকিত ক'রে ওরা চলে গেল।

মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠল মহাপাত্রের। যারা চলে গেল তারা কারা? তারা-সব টাইগারের অনুচর।

বিকট আওয়াজ করে অন্ধকার আকাশ দিয়ে ভারি এরোপ্লেন উড়ে গেল। একবার ঘাড় তুলে তাকালেন মহাপাত্র। কিছু দেখতে পেলেন না। তারার মত ছোট ছোট কয়েকটা চলন্ত আলো দেখলেন মাত্র। গোরুর গাড়ির চাকার মৃদু আর্তনাদ তাঁর কানে লেগে আছে। নিশুতি রাত্রে এইখানে মেঠো পথ ডিঙিয়ে তারা সার বেঁধে চলে যেত ধীরে ধীরে। তারা সব আজ গেল কোথায়?

কলুপাড়ার দিক থেকে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। মহাপাত্রের এখন কোনো কাজ নেই। কুকুরের ডাক শুনে তিনি সেইদিকে পা বাড়ালেন। বেণের মাঠ পার হয়ে তিনি চললেন সোজা। তাঁর পাশ দিয়ে তিনটি লোক চলে গেল। এরা বুঝি তারাই, যারা তাঁর মুখ দেখার জন্যে কিছুক্ষণ আগে উঁকি দিয়েছিল।

—মাধব।

মাধব নাকি বাসায় নেই। রাস্তার উপর মাধবের দুটো বলদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে, শীত ধরেছে বুঝি তাদের। ঘানি ঘোরা এখন বন্ধ, মাধব তাই হয়তো এদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ঘানি ঘুরছে না, তবে তেল আসছে কোথা থেকে— সংসারের চাকা তবে ঘুরছে কী করে?

মাধবের ছেলে বলল, বাবা তো গোয়ালন্দে থাকে, লড়াইয়ের কাজ নিয়েছে, জানেন না?

জানত না মহাপাত্র।

শীতের রাত। এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি বোধ হচ্ছে। জোনাকিরাও শীতে কাবু হয়ে গেছে নাকি? জমাট অন্ধকারের মধ্যেও একটাকেও দপ্‌দপ্‌ করতে দেখা যাচ্ছে না। হাতে লাঠি, গায়ে আলোয়ান মহাপত্রে চলেছে; অন্ধকারেই একটু মুচকে হেসে মহাপাত্র ভাবল, জোনাকিরাও দল বেঁধে গোয়ালন্দ চলে গেল নাকি?

শাপলা আর কলমিতে পুকুরপাড়ে জঙ্গল জমে উঠেছে। পুকুরের কিনার দিয়ে ঘরে ফিরছে মহাপাত্র। ওই যে সামনে প্রেতের মত বীভৎস একটা অন্ধকার মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্তূপ, ওই তাঁর বাড়ি। চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে একটা সিংহদ্বার। সেই সিংহদ্বারে এখন শেয়ালের উৎপাতই বেশি; মাঝরাতে তারা

এখানে জড়ো হয়ে জট্‌লা করে। সেই ভাঙা সিংহদরোজা দিয়ে মহাপাত্র ঢুকলেন। বারান্দায় ব'সে কে ?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি রাজারাম।

মাঝে দিন কতক দেখা হয় নি দুজনের। মহাপাত্র বললেন, কি, সমাচার কি ? দেখাশুনা নেই কেন ?

—কোম্পানির কাজ। আবার নতুন কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে। বিমান-ঘাঁটি তৈরির।

—ভালো। ভিতরে এসো।

মহাপাত্র হারিকেন জাললেন, মেঝেয় একটা কম্বল বিছানো। পায়ের কাছে একটা পিতলের ঘটি ; ওদিকে একটা বেতের স্যুটকেস্। মাথার কাছে গাদা করা খবরের কাগজ আর খানকতক বই।

—দেশে ফিরবে না ?

রাজারাম বলল, কাজ খতম হলেই সে ফিরবে। রুপেয়া না হলে তো দিন চলবে না। বুড়া বাপ, বুড়া মা। তাদের চলবে কী করে ?

—আর কে আছে দেশে।

—ভাই আছে, বহিন আছে।

খুঁচিয়ে ঘা করে দিলেন মহাপাত্র। মা-বাপ-ভাই সবার কথাই তার মনে হল বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে হল তার বোনের কথা —রুক্মিণীর কথা। পাঁচ নদীর দেশের ছবি আঁকত রাজারাম তার বোনের হাতের উপর। তার পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে নিয়ে বলত, এই ছাখ শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী বিতস্তা চন্দ্রভাগা। তার বাপের নিজের হাতে বাঁধা তাদের ডেরাটার কথা তার মনে পড়ল। সামনে এবড়ো মাঠ। গাঁওপঞ্চের বৈঠক বসত তাদের আঙনে। পঞ্চের চাঁই তার বাপ। কৃপারাম আহির সুচেতপুরের চৌধুরী। এক হাঁকে লোক হাজির।

রাস্তাকাটরায় যখন গোষ্ঠ-উৎসব শুরু হত, তখন সেখানে বসত গোরুর মেলা। ফাঁকা মাঠ ভরে গোরুর পাল ছুটিয়ে আনা হত মেলায়। দূর থেকে দেখে মনে হত, মাঠ পার হয়ে ধুলো উড়িয়ে মস্ত এক সেপাইয়ের দল আসছে। তাদের গোশালাটার কথাও মনে পড়ল রাজারামের, আঠার মত দুপ।

—কি ভাবছ ভায়া?

রাজারাম বলল, ভাবছি লড়াই খতম হবে কবে।

—আমাদের খতম না ক'রে এ খতম হবে না, রাজারামবাবু।

রাজারামবাবু? সে আবার বাবু হল কবে থেকে? একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। কিন্তু কি ব'লে প্রতিবাদ করবে ভেবে পেল না।

ঘন দাড়িতে ঢাকা মহাপাত্রের মুখ, লণ্ঠনের আলোয় তাকে একেবারে আলাদা লোক ব'লে মনে হচ্ছে। মনে তো হচ্ছে, কিন্তু তারই সঙ্গে আর যার কথা মনে হচ্ছে তার কথা কি খুলে বলতে হবে? তার পরনে খড়কে-ডুরে, হাতে রুপোর বালা, নাকে নাকছাবি।

গুম্ হয়ে বসে ছিলেন মহাপাত্র, গম্ভীর আওয়াজ করে হঠাৎ বলে উঠলেন, রামেশ্বরটা বড় লোভী। চালের দর বাড়ছে দেখে খুব আহ্লাদ।

—হুঁ। বিস্তর সেপাই এসে গেছে, সব রাক্ষসের মত খাচ্ছে। দাম চড়বে না? তা ছাড়া, মজুতও করা হচ্ছে কিছু কিছু। আমাদের লাহিড়ি সাহেবও মজুত করছেন, শুনতে পাই।

মহাপাত্র বললেন, লোভের শাস্তি আছেই, জেনো রেখো রাজারাম।

কিন্তু রাজারাম এখন এ কথা শুনতে আসে নি। মহাদেবপুর তার কাছে মিষ্টি হয়ে গেছে কেন, এ কথাটা সে তো আর খুলে বলতে পারে না। মহাপাত্রের সঙ্গে একদিন সে গিয়ে দেখে এসেছে যে দাওয়াটা, সেই দাওয়া কেবলই তাকে যেন টানতে থাকে। কিন্তু সে পথে সে

যাবে কোন্ অছিলায়? মায়াটা তাই এখন পড়েছে মহাপাত্রের উপর, এখন এঁকেই তার একমাত্র সহায় বলে ঠেকে, ইনিই যেন তার একমাত্র সম্বল।

রাজারাম বলল, নয়া দেশে এসেছি, কিন্তু ডিউটি নিয়ে এত আটক থাকতে হয় যে, এ গাঁ-টাই তার ভালো করে দেখা হল না।

—আর না দেখলে, এখন আর দেখার আছে কি এখানে?

কিছু নেই? রাজারাম মহাপাত্রের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল একবার। কেরোসিনের আলোয় লোকটাকে পুরোপুরি নতুন মানুষ বলে ঠেকছে। এই কথা শুনে এঁকে যেন আরও অপরিচিত বলে তার বোধ হল।

মহাপাত্র বললেন, এ গাঁ ছিল সোনার গাঁ। কী না ছিল এখানে? কামার ছিল, কুমোর ছিল, ঢাকী ছিল, মালাকার ছিল, তাঁতী ছিল, কলু ছিল। আজ তারা কোথায় জানো?

উৎসুক চোখে তাকিয়ে রাজারাম বলল, কোথায়?

—গোয়ালন্দ। গম্ভীর জবাব দিলেন মহাপাত্র। বললেন, চোখের সামনে এই গ্রাম এমন ছিবড়ে হয়ে গেল— ভাবা যায় না রাজারাম।

একটু ভেবে বললেন, কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন? যদি সঙ্গে একটা মরদ পাই, তবে এখনও একে আঁকড়ে ধরা যায়। টিকিয়ে রাখা যাবে কি না সে পরের কথা।

চট করে রাজারাম বলে উঠতে পারল না যে সে আছে সঙ্গে, সে থাকবে সঙ্গে। সে শুধু মহাপাত্রের দিকে একটু সরে বসল। তার কনুইয়ের ধাক্কায় হারিকেন সরে যাওয়ায় অন্ধকার হয়ে গেলেন মহাপাত্র, তাঁর মুখের আর মাথার চুলের ছায়ায় যেন হারিয়ে গেলেন তিনি।

হারিকেন টেনে নিয়ে রাজারাম বলল, কি করতে চান?

—তেমন কিছু না। সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। শুধু বলতে চাই, লড়াই চিরকাল থাকবে না। যা থাকবে চিরকাল, তার মত হয়ে সমঝে চল।

রাজারাম সোজা হয়ে বসে বলল, বলুন-না।

চুল সমেত মস্ত মাথাটা নাড়লেন মহাপাত্র, বললেন, কেউ শুনবে না। বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছি, এখন কেউ আর আমার কথা শোনে না। আগে শুনত। ওঠ বললে উঠত, ব'স্ বললে বসত—গাঁ সুদ্ধ সবাই।

—ভালো ক'রে বললে আজও শুনবে।

—শুনবে? মহাপাত্র যেন জোর পেয়ে গেলেন, ঠিক বলছ শুনবে?

রাজারাম আর-কিছু বলল না।

টান হয়ে শুয়ে পড়লেন মহাপাত্র। বললেন, রাজারাম, গান গাও একটা। গলা ছেড়ে গাইতে না চাও, একটু গুনগুন কর।

আপত্তি করল না রাজারাম। হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে সে বসে ছিল। সেইভাবে বসে বসেই সে গাইতে লাগল। সে গাইল— খেদ নেই, আপসোস নেই, নহরে যে বন্যা এসেছে সে নেমে যাবেই; আকাশে যে বাজ ডাকছে, তা থেমে যাবেই; কিন্তু প্রাণে যে প্রেম ঢুকেছে সেই শুধু যাবে না। দিনে দিনে সে দুনো হবে।

গান থামলে মহাপাত্র উঠে বসলেন। একটু তারিফও করলেন না। বললেন, চল, রাত হয়েছে, খানিকটা পথ এগিয়ে দিই।

পুকুরপাড় দিয়ে যেতে যেতে মহাপাত্র বললেন, গান দিয়ে প্রাণ মাতাবার কথা শোনা যায়। তোমার গানটা বেশ লাগল। তুলসীদাসের ভণিতা বোধ হয়?

রাজারাম জানে না। তাই সে কোনো জবাব দিলে না। মহাপাত্রের পিছন পিছন হেঁটে চলল চুপচাপ।

কয়েকদিনের মধ্যে হালচাল যেন চটপট বদলে যেতে লাগল। চালের দাম বাড়তে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে।

রামেশ্বরের সঙ্গে দেখা। মহাপাত্র বললেন, কেমন মনে হচ্ছে?

—কিসের কথা বলছেন ?

—বাজার কেমন ?

—মন্দ কি ?

—কথা আছে। বিকেলে যাব।

যোগেশ মহাপাত্র ও রাজারাম আহির এবার নাকি কাজে নেমেছে। এক বৃদ্ধ আর এক জোয়ান। তেলিপাড়া কলুপাড়া আর কুমোরপাড়া পার হয়ে দুজনে কৌশিকের বাড়িতে এসে হাজির। সামনের চত্বরে পাহাড়প্রমাণ ধান ঢালা। ওপাশে খড়ের গাদা। দুটো গোরুর-গাড়ি ফেলা আছে পাশে, দুজোড়া গোরু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে।

কৌশিক বলল, আসুন কর্তা।

—এত ধান কিসের, কৌশিক।

—গোলায় তুলছি।

হাতের কাছে একটা মোড়া ছিল, মহাপাত্রের দিকে এগিয়ে দিল সেটা। রাজারাম কাৎ-করে-ফেলা গোরুর-গাড়িটার উপর বসল।

মহাপাত্র বলল, গাঁয়ের হাল কি হল, কৌশিক। নিত্য ঘরে ঘরে পোলাও-পরমান্ন খাওয়া শুরু হল যে।

—কি রকম ?

—তা নয় তো কি। চালের যা দাম বেড়েছে, তাতে তো অমনি খরচই পড়ছে হরে-দরে।

হো হো করে হেসে উঠল কৌশিক, বলল, আছেন কোথায় কর্তা-

মশায়, দর তো এখন উঠ্‌তিমুখে, কোথায় গিয়ে ঠেকে ছ্যাখেন। সঙ্গে ও কে?

—চেনো না?

কৌশিক একটু এগিয়ে এসে বলল, তাই বলেন, চেনাচেনা ঠেকে। উনি আমাদের সেই কাজ্‌রিবাবু না?

মহাপাত্র না হেসে পারলেন না, মোড়ার মধ্যেই নড়েচড়ে বসে রাজারামের দিকে একবার তাকালেন, তার পর কৌশিকের দিকে চেয়ে বললেন, ঠিকই ধরেছ গোলাবাবু।

রাজারাম তামাশাটা ধরতে পারল, তাই সে-ও এ হাসিতে যোগ দিল।

মহাপাত্র ব্যাখ্যা করে কৌশিককে বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, ওর নাম রাজারাম, কাজ্‌রি গায় বলে ও যদি কাজ্‌রিবাবু হয় তাহলে তুমি গোলাদার গোলাবাবু কেন না হবে?

—এই কথা? সপ্রতিভ ভাবেই সে বলল, নাম কি অত মনে রাখা যায়, কর্তামশায়।

বাইরে এত হাসি কিসের? খামার থেকে ধান এনে ঢালা হচ্ছে, তাতে এত হাসাহাসি কেন? দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে চাঁচের বেড়ার উপর দিয়ে উঁকি দিলো মধুমালা।

হামনদিস্তায় হলুদ কুটছিল কৌশিকের বৌ, মেয়েকে শুধাল, কে রে?

মধুমালা বলল, রাজা। রাজারাম।

তার বাপের মনে থাকতে না পারে, কিন্তু মেয়ে নামটা ভোলে নি। এত দূর থেকে দেখেও সে দু মাস আগে দেখা লোকটাকে চিনতে পারল। মার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, সেই যে গো, এই রোয়াকে গান গেয়েছিল।

অনুনয় করে সে বলল, বাবাকে ডেকে বল-না, মা। একটা গান হোক।

—আমার আর কাজ নেই খেয়ে-দেয়ে।

—আচ্ছা, না বললে। আমিই বলতে পারি।

খিড়কি-দরজার ধারে গিয়ে মধুমালা তার বাবাকে ডাকল।

ভিতর থেকে অনুরোধ বহন করে এল বটে কৌশিক, কিন্তু সে অনুরোধ রাখতে পারল না রাজারাম। আলো-আঁধারি ঘরে গুনগুন করে গান গাওয়া যায় বলেই খোলা আকাশের নীচে এই ভাবে গা ছেড়ে বসে কি গান গাওয়া চলে ?

মহাপাত্র বলল, গান দিয়ে প্রাণ মাতিয়ে দিয়ে এখন কথা না রাখলে চলবে কেন।

রাজারাম সলজ্জভাবে কৌশিকের দিকে চেয়ে বলল, আর একদিন হবে।

মহাপাত্র উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, চল পালাই। লক্ষণ ভালো না হে, রাজারাম। চারদিকে সাজ-সাজ সাড়া, তার মধ্যেও যারা এভাবে তাড়া করে, বুঝতে হবে, তাদের অন্য কোনো মতলব আছে।

হাসতে হাসতে রাজারামের হাত ধরে টেনে মহামাত্র হাঁটা দিলেন। সারি সারি খরের আঁটি দাঁড করানো। পাশ দিয়ে যেতে টাটকা আউড়ের গন্ধে প্রাণ যেন তাঁদের মেতে গেল।

আকাশে গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনে তাকালেন মহাপাত্র। চং নয়, এরোপ্লেন। বেতের পাৎলা ছিলায় হাওয়া লাগলে অবিকল এমনি আওয়াজ করে চং। কিন্তু সে শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

সরু সাঁকো পেরিয়ে একটু এগতেই রামেশ্বরের ঘর দেখা গেল। ওর কাছে যেতে তেমন উৎসাহ হয় না। লোকটা বড় লোভী। এত লোভ ও পেলো কোথা থেকে, এই বড় আশ্চর্য লাগে। আগে কেমন ছিল সাদাসিধে, আজকাল আঁকাবাঁকা কথা বলে। বলে, কাঁচা

পয়সার মায়া কার না থাকে ? খড়ের আঁটি টাকার কাঁদি, যেমন জোটে তেমন বাঁধি।

রামেশ্বর হুঁকো খাচ্ছিল। তেল-কুচকুচে মাথা, পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে বসে একমনে তামাক টানছে, কাছেই কয়েকটা কবুতর বকবক্ শব্দ করে ধান খুঁটে খুঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অমায়িক হাসি হেসে রামেশ্বর বলল, আসুন। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। সে-ই গেলেন, তার পর থেকে আর দেখাই নাই।

রাজারামের বুকের ভিতরটা হুঁকোর মত গুড়গুড় গুড়গুড় করে উঠছে কেন যেন। সে তাকাল এদিক ওদিক। ওই লাউয়ের মাচা, ভিতরের ওই চালের উপর কুমড়ো, শিম আর বরবটি লতা। কৌশিকের বাড়িটা কেমন-যেন বন্ধ্যা, কেমন-যেন নির্জীব। কিন্তু এখানে গাছ লতা পাতা ফলে আর ফুলে ভরপুর ; সব-কিছুতে প্রাণের একটা নতুন আমেজ।

হোগলার চাটাই বিছানোই ছিল, মহামাত্র বসলেন, রাজারাম বসল।

—কাজে এসেছি রামেশ্বর।

—কি কাজ, বলুন। হুঁকো বাতার দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রামেশ্বর তৈরি হয়ে বসল, বলল, কি কাজ ?

—তোমার যদি অসুবিধে হয়, তবে সরাসরি তা বলে দিয়ো। মহাপাত্র ভূমিকা করলেন।

রামেশ্বর হেসে বলল, মানুষের সুবিধে-অসুবিধের কথা না ভেবে আপনি কি কিছু বলেন ?

মহাপাত্র বললেন, তা হয়তো বলিনে। দেশে অনেক বিদেশী ঢুকেছে, জানো তো ? বুঝতে পারলে না ? তবে অমন করে তাকাচ্ছ কেন।

বলছি, পল্টনদের কথা। তারা বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে। তাদের ঠেকাতে হবে।

রামেশ্বর ভয় পেয়ে গেল যেন, বলল, ওই বোলতার চাকে খোঁচা দিতে চান বুঝি? বড় পাজি ওরা, ওদের ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

মহাপাত্র রামেশ্বরকে বোঝালেন, বললেন, ওদের খোঁচা দিতে চাইনে; খোঁচা দিতে চাই নিজেদেরই।

অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে রামেশ্বর মহাপাত্রের দিকে চেয়ে রইল। এই স্বদেশী ডাকাত আবার নতুন কোন্ ডাকাতির মতলব করছে, কে জানে? রামেশ্বর এ কথা চাপা দেবার জন্যে বলল, ভিতরের দাওয়ায় গিয়ে বসা যাক। মেয়েরা বলছিল, ইনি নাকি ভালো গান গাইতে পারেন, একটু শুনতে পেলে মন্দ হত না।

ভিতরটা আনন্দে নেচে উঠল রাজারামের। সড়কের ধারে নিঃসঙ্গ গুমটিতে বসে তার প্রাণমন মাৎ করে দিয়েছিল যে, তার দেখা পাবার জন্যে তার ভিতরটা একটু ছটফটই করে উঠেছে এখন। মহাপাত্র কিছু মন্তব্য করার আগেই রাজারাম ওঠার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে বসল।

মহাপাত্র দুজনের মুখের দিকে একবার তাকালেন— রামেশ্বরের আর রাজারামের। বাঁ হাঁটু পেতে বসা ছিল, এবার তিনি ডান হাঁটু পেতে বসলেন, বললেন, কিন্তু কাজের কথাটা হয়ে গেলে হত না? তোমার ঘরটা পথের ধারেই, তাই তোমার কাছে আসা।

—আদেশ করুন।

—তোমার এই বাইরের দাওয়াটায় আমরা একটু বসব।

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই সামান্য কথা? আসুন-না, উঠে আসুন। মানিককে বলি, দুটো মোড়া এনে দিক।

মহাপাত্র তাকে বসতে ইশারা করে বললেন, এখন নয় শুধু, রোজ। রোজ সকালে আর বিকেলে। একটু কাজ-কম্ম করতে হবে তো! সঙ্গে সাঙাতও যখন পেয়ে গিয়েছি একটা। বড় ভালো ছেলে, রামেশ্বর, এই রাজারাম। বাইরেটা এর হয়তো কাঠখোট্টা, কিন্তু ভিতরটা তুলো। ক'দিন আলাপ করে ভালো লেগেছে।

রামেশ্বর ভাবিত হল। একবার হুঁকোর দিকে হাত বাড়িয়ে ফেলেছিল, মহাপাত্রের দিকে চেয়েই হাত টেনে নিল, বলল, কি কাজ করবেন?

—আন্দোলন। গাঁয়ের ছেলে পল্টনের গোলামি করবে না।

আঁৎকে উঠল রামেশ্বর, বলল, এই দাওয়া থেকে সেই কথা চেঁচিয়ে বলবেন?

—চ্যাচাব কেন? মহাপাত্র যেন আশ্বাস দিয়ে বললেন, গাঁয়ের মোড়লদের এখানে একত্র করব, তাদের বোঝাব। আমি আছি, রাজারাম আছে, তুমি আছ, কৌশিক কেশব— ওরাও হয়তো আছে। সব এক হতে হবে রামেশ্বর, নইলে কিন্তু সব—

কথার শেষটুকু শোনার ধৈর্য যেন হল না রামেশ্বরের, সে মাথা নাড়তে লাগল। মহাপাত্রের মুখের উপর সরাসরি 'না' বলে দিতে তার মুখে আটকাচ্ছিল।

ব্যথিত হলেন হয়তো মহাপাত্র, একটু থেমে তিনি বললেন, এখন আমি নিজেই গাঁর বা'র হয়ে গেছি, আমার বাড়ি বন-জঙ্গলের এক কোণে পড়ে আছে। তা না হলে সেখানে বসেই আমরা যা করার হয়তো করতে পারতাম।

রামেশ্বর বলল, কথা দিতে পারলাম না, কর্তা। পরামর্শ করে কাল বলব।

—বেশ। এখনি কথা চাই নে। ভেবে ত্যাখো।

মহাপাত্র উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গেসঙ্গে রাজারামকেও উঠতে হল। কিন্তু গানটা? তার প্রাণের মধ্যে যে গুঞ্জনটা তাকে মাতোয়ারা করে তুলেছে তার তো কিছু হল না। মহাপাত্রকে সহায় ভেবে সে তাঁর সঙ্গেসঙ্গে এল বটে, কিন্তু তিনিই সব বানচাল করে দিলেন আজ? ফিরে ফিরে চাওয়া যায় না। কিন্তু যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার সমস্তটা প্রাণ যেন আর একবার ফিরে যেতে চাইছে ওই দাওয়ায়। চোখের সামনে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার।

ধানকোড়ার ক্যাম্পে বসে সেদিন অনেক রাত অবধি ভাবল রাজারাম। এক লহমার দেখা একটা আগুনের ফুল্‌কি তার সারা জন্মটাকে এমন আলো করে দিল কী করে? এটা তার ক্ষণিকের মায়া, না, নিমেষের স্বপ্ন? মায়া বা মোহ যেন নয়, এ তার সত্যিকারের ভালোবাসাই হবে। প্রেমটা নাকি বেনো-জল, তার আচমকা আসাটা এমনি করেই তাক লাগিয়ে দেয় নাকি। এ কথা শুনেছে রাজারাম, কিন্তু বিশ্বাস করে নি। আজ এই ক্যাম্পে একা একা বসে কথাটা তার ভয়ানক বিশ্বাস হচ্ছে। সে নিজেই তাজ্জব হচ্ছে, আর পাঁচজন জানলে অবাক হবে— সে আর আশ্চর্য কী।

জানলার ফাঁক দিয়ে শীতের কনকনে হাওয়া এসে তার হাড়ে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে, রাজারাম হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধও করল না। মহাপাত্র আজ বড় আহাম্মকি করলেন। রামেশ্বরকে আর একটু চাপ দিলে নিশ্চয় সে রাজী হয়ে যেত।

—কারো উপর জুলুম করতে চাই নে, রাজারাম। পরদিন মহাপাত্র এসে বললেন, তাই ঠিক করলাম, আমার ওখানেই হবে। সারারাত ভাবলাম। যে ভয় পায়, তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি?

রাজারাম সংকোচের সঙ্গেই বলল, কিন্তু ভয় তো ভাঙাতে হবে।

—ভয়টা ওর আসল রোগ নয়, আসল রোগ লোভ। ভয় কে পায় জানো, যার ভিতরে খুঁৎ আছে, যার মতলবে গল্‌তি আছে।

রাজারাম এত বড় কথার মানে বুঝতে পারল না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল মহাপাত্রের দিকে। বলল, আমি যাব।

—কোথায় ?

—রামেশ্বরের কাছে। তাকে সমঝাবো।

মহাপাত্র ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এটা সম্ভব কি না। যে বুঝবার, সে আপনি বোঝে ; বোঝাতে গিয়ে জুলুম করতে হয় না। কিন্তু ওই স্টল থেকে ছেলেদের টেনে নিয়ে এসে মাঠে নামিয়ে দেওয়া যায় কী করে, এইটে যেন তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেকক্ষণ এই-ভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন। রাজারামের কথার জবাব না দিয়েই হাঁটা দিলেন তিনি— হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। ধান-কোড়ার ক্যাম্পে অবাক হয়ে বসে রইল রাজারাম।

বোঝাতেও নয়, বুঝতেও নয়, রাজারাম উঠল যেন খুঁজতে। মহাপাত্রকে নয়, রামেশ্বরকে নয়। তবে কা'কে ? সরু মেটে রাস্তা পার হয়ে নতুন মোটা সড়কে এসে পড়ল সে। রোদে ঝিক্‌মিক করছে রাস্তা। সে চলেছে বটে, কিন্তু পায়ে পায়ে এমন জড়িয়ে যাবার মত হচ্ছে কেন, তা হয়তো সে জানে।

এই পথ। এই পথে খানিকটা এগিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু একটু থমকে থামার পর সে আবার এগলো। একটু এগতেই সে চমকাল। কে ও ? জামগাছটার আড়ালে অমন করে লুকিয়ে পড়ল কে ? রাজারাম হেঁটে চলল। কিন্তু কাছে এসে দেখল, কেউ নয়। এ তবে কি তার চোখের ভুল ? এই দিনের আলোতে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কেন

'সে তবে দেখল? মাথা নিচু করে ভাবছিল রাজারাম, মাথা তুলতেই সে দেখল— ওই কে হেঁটে চলেছে তর্তর করে। ওই তো গিয়ে ঢুকল রামেশ্বরের বাড়িতে।

মধুমালা ছুটে উঠোনে এসে দাঁড়াল। লবঙ্গ সামনেই ছিল, বলল, কি রে? আজও আবার মোষে তাড়া করল নাকি? তোকে মহিষী না করে ছাড়বে না দেখছি।

মধুমালা খিলখিল করে হেসে কাছে এসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, মহিষ না রে মহিষ না, আজ এসেছে রাজা।

লবঙ্গ বলল, চল তো দেখি।

—আয়।

উঠোনের ডালের গোলাটা অযথা একবার ঘুরে দুজনে চলে এল বাইরে। খড়ের আঁটি সার সার দাঁড় করানো। ওপাশে একটা গাড়ি কাৎ করে ফেলা। ধানের গোলার কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে জাবর কাটছে গোরু। সামনে সরু রাস্তার এক কোণে শুকনো পাতার সঙ্গে খেলা করছে ধুলো। এ ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখা গেল না।

লবঙ্গ বলল, দেখলাম। মস্ত রাজা।

—নিশ্চয় লুকিয়েছে। আশেপাশে কোথাও-না-কোথাও আছে নির্ঘাত।

মালাই এগিয়ে গিয়ে ধানের গোলার চারদিক ঘুরে এল, ঠোঁট উল্টে বলল, পালিয়েছে তবে।

লবঙ্গ হাসতে হাসতে বলল, তোর রাজা তো তবে আস্ত ভীতু রে!

মালা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, কে জানে? ভয়-ডর কা'কে বলে জানিও নে, মানিও নে। কোথাকার কে না কে, তার ঠিক নেই।

চান্ সেরে মালা চলে গেল। মালার সেদিনের রসিকতাটা তাকে

যেন কেবলই খোঁচাচ্ছে। লোকটার সঙ্গে নাকি লবঙ্গকেই মানায়। ভালো। মালা চলে যাবার পর লবঙ্গ একবার বাইরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড় করানো আঁটি থেকে এক টুকরো খড় ছিঁড়ে নিয়ে দাঁত খুঁটচ্ছে আর ভাবছে, মালাটা কী বেহায়া। মনে যা ভাবা যায় মুখে তা চট করে ও বলে কী করে! লবঙ্গর মনে কি কোনো ইচ্ছে নেই? ইচ্ছে আছে বলেই তা ঢাক পিটিয়ে জানাতে হবে? গাঁ-টা নাকি ভেজালে ভরপুর হয়ে উঠেছে— সে দিন কে যেন বলছিল কথাটা? মহাপাত্রই বোধ হয়। লবঙ্গ ভাবল, এইসব হালচাল দেখেই এ কথা বলে থাকবেন তিনি।

রামেশ্বর এসে হাজির। বলল, এখানে দাঁড়িয়ে করছিস কি?

—রোদ পোয়াচ্ছি। কুয়োর জল যা ঠাণ্ডা, সারা শরীর হিম হয়ে গেল।

রামেশ্বর বলল, ঠাণ্ডাও প'ড়েছে। এমন শীত আর বুঝি পড়েনি। এখন যা হচ্ছে সবই আজগুবি। যুদ্ধটা যেন সব উলটে পালটে দিচ্ছে রে, লবঙ্গ।

বাপের পিছন পিছন লবঙ্গ ভিতরে চলে এল।

সুখদা জিজ্ঞাসা করল, আজ এত বেলা যে?

—মহাজনদের নিয়ে কি ঝক্‌মারির শেষ আছে? তার পর পথে রাজারামের সঙ্গে দেখা। বলে, ধান-চাল বেচা-কেনা বারণ। মহাপাত্র নাকি মানা করেছে। যত-সব বাউণ্ডুলের বুদ্ধি। চাল বেচব না তো খাব কী? হাঁ-হাঁ করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কুলাবে কি ক'রে? যে ধান ছিল চোদ্দ আনা, তার দাম এখন সাড়ে আট টাকা। মহাপাত্র নাকি শাসিয়েছে। আর বলেছে, সব কিনে নিয়ে দেশের লোককে না খাইয়ে মারার নাকি মতলব করেছে ওরা।

সুখদা বলল, ওরা কে ?

—যারা লড়াই করছে।

—আজগুবি কথা।

পোষমাসে খেতে নতুন ধান এল। কৌশিক কেশব খগেন রামেশ্বর এতে একটু যেন ভয় পেল। ধানের মণ সাড়ে আট টাকা থেকে নেমে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। কিন্তু দাম কমল না দেখে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে, এমন সময় মহাপাত্র এসে ডাক দিলেন।

মহাপাত্র বললেন, তোমাদের উপর রাগ করে বসে ছিলাম। কিন্তু রেগে থেকে লাভ কি ? তাই আবার এলাম।

কৌশিক গদ্‌গদ ভাবে বলল, খবর কি বলেন ?

—লড়াইয়ের কথা বলছ ? খগেন একটু সরে বসে জিজ্ঞাসা করল।

মহাপাত্র জবাব দিলেন, বললেন, খবর কিছু ভালো না। চাটগাঁ ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে।

—কি ? লড়াই ? কেশব উবু হয়ে বসে ছিল, বসে বসেই সে হেঁটে একটু এগিয়ে এল।

মহাপাত্র বললেন, তার চেয়েও ভীষণ।

—সেটা আবার কি ? দুই চোখ বড় ক'রে তাকাল কৌশিক।

—দুর্ভিক্ষ। বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন মহাপাত্র।

রামেশ্বর হেসে উঠল। বলল, খেতে এল নতুন ধান, এখন হবে দুর্ভিক্ষ ?

মহাপাত্র প্রতিবাদ করলেন না, বললেন, দুকদম হেঁটে যদি আমার ওখানে একবার যাও, সব বুঝিয়ে বলতে পারি। শিবলা বাইনাজুড়ি ধানকোড়া আর কিষ্টপুরী থেকে সবাই আসতে রাজি হয়েছে। এক জায়গায় জড়ো হয়ে না বসলে কথা হয় কী করে ?

এরা সবাই রাজি হল। কিছু-একটা কাজের জন্যে যে এরা যাবে এমন মনে হল না এদের মুখের দিকে চেয়ে। আর-পাঁচজন যদি যায়, তবে এদের যেতেই-বা ক্ষতি কি? কিন্তু ভয় ওদের একজনকে।

—কে সে? রুখে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন মহাপাত্র।

খগেন বলল, টাইগার। লোকটা বাঘ।

মহাপাত্র বললেন, তোমরাও শৃগাল নও, এই কথা বুঝিয়ে দিতে পারলেই ও-ও ভয় পাবে তোমাদের দেখে।

রাজারাম এতক্ষণ কথা বলে নি, একটু তফাতে বসে সে এদের আলাপ-আলোচনা শুনছিল, বলল, আমি চিনি ওকে। ওর ক্যাম্পে কাজ করেছি। ভয় দেখাতে পারলে ও ভয় পায়।

—কি রকম।

হাত দিয়ে ফণা দেখিয়ে রাজারাম বলল, ফোঁস করতে হবে।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। রাজারামের মুখে ভাঙা বাংলা শুনে ওদের খুব মজা লেগেছে, সে আবার সাপের মত কুলোপানা চক্কর দেখাবার মতলব দিচ্ছে— এটা যেন আরও মজা।

অপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রাজারাম এগিয়ে এল, গলার স্বর আরও স্পষ্ট করে ও বলল, সাচ্চা কথা। আমি চিনি ওকে।

—চিনি তো আমরাও। গা ছেড়ে দিয়ে খগেন বলল, কিন্তু চিনি বলেই ভয় করব না, এমন কি কথা আছে।

কৌশিক তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, আর চিনি বলেই তো ভয়।

মহাপাত্র বলল, ভয় ছাড় সবাই। যত আস্কারা দেবে, ভয় কিন্তু বাড়বে ততই। তার পর আর থই পাওয়া যাবে না।

মাথার উপর দিয়ে বিকট আওয়াজ করে একটা এরোপ্লেন উড়ে

গেল। সকলে একসঙ্গে মাথা তুলে তাকাল। তাদের এই বৈঠকের সব কথা কেউ শুনে ফেলল কি না, হয়তো ওরা তাই ভাবল।

মহাপাত্র তাদের ডেকেছিলেন, কিন্তু কেউ আসে নি। এসেছিল একমাত্র দিগম্বর পারেখ। বেতের ঝুড়ি-মোড়ার কারবার করে সে, এসে বলল, এখন কি করা ?

—যত পার বেচে দাও। একটু যেন তেতেই বললেন মহাপাত্র। থেমে বললেন, যাদের হুঁশিয়ার হতে বলছি তারা-সব বেহুশ হয়ে বসছে, আর তুমি এসে বলছ, মাল ছাড়বে না। তোমার মালের দাম কি হে, দিগম্বর ?

—বেতের দাম নেই ?

—আছে। যদি তা কাজে লাগাতে পার। এমনি করে ধরতে হবে, দিগম্বর, আর এমনি করে কাজে লাগাতে হবে।

মহাপাত্র হাত নেড়ে নেড়ে দেখালেন। গাঁয়ের মোড়লদের বেকুবি দেখে তেতে তিনি ছিলেনই, এখন যেন প্রায় ক্ষেপে গেছেন। নিজেকে তাঁর অসহায় বলে ঠেকছে। একদিন মনে হয়েছিল, এই গাঁ তাঁরই— তিনি যেমন ভাবে চালাতে চাইবেন, সেই ভাবেই এ চলবে। দু-চার বছর আগেও সকলে তাঁর কথামত চলত-ফিরত উঠত-বসত। কিন্তু আজ তাঁর পায়ের নীচ থেকে সে মাটি যেন সরে গেছে। তিনি এখন যেন হাওয়ায় দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এর মধ্যে থেকেও একটু সান্ত্বনা পান মহাপাত্র। নিজের দেশের লোক আজ তাঁর কথা বুঝছে না, আজ তাঁর কথা মানছে না বটে, কিন্তু ভিনদেশী এক ছেলে তাঁর কথা সব বুঝেছে। কোনোদিন এদের পরিচয় ছিল না, কোনোদিন কেউ কাউকে চিনত না জানত না, কিন্তু

এখানে তাদের দেখাশুনা আলাপ-পরিচয় যেমন হয়েছে, তেমনি মনের সঙ্গে মনের মিলও ঘটে গেছে অনেকখানি।

দিগম্বর পারেখ চলে গেল, সে মহাপাত্রের মতি-গতি তেমন বুঝতে পারল না যেন। ইনি রাগতে জানেন, গরম হতে জানেন— এমন কথা জানা ছিল না পারেখের। তাই সে সটান চলে এসেছিল এখানে।

—জানো, রাজারাম, এরা না মরে ছাড়বে না।

না মরে ছাড়বে না?—এ কথা এর আগে শুনেছে রাজারাম। তাই সে এই শোনা কথাটা শুনে যেন চমকে উঠল। কথাটা বলেছিল তার বাপ কৃপারাম। জিনিসপত্র দিন দিন মাগ্‌গি হয়ে চলেছে, তবু তারা তিন ভাই গোশালা ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না। তাদের বাপের কথা অমান্য করেও তারা গাঁয়েই থেকে যাবার জন্যে চুপ করে বসে ছিল। শুকদেব সহদেব আর সে নিজে। নিজের ডেরা ছাড়ার কথা তারা তখনো ভাবতে শেখে নি। মায়ায় পড়ে গিয়েছিল বুঝি তারা। তাদের এই হালচাল দেখে বিরক্ত হয়ে কৃপারাম একদিন বলেছিল এইকথা কেশবতীকে। রাজারাম নিজের কানে শুনেছে। যা দুধ হত তা বেচে কি আর অতজন মানুষের চলে! তার বুড়ো বাপকেও কতদিন চানা চিবিয়ে কাটাতে হয়েছে— ছোটবোন রুক্মিণীকেও। ফরবেশগঞ্জের মেলায় গিয়ে সে গেঁহু কিনে আনত, তাতে কয়েক পয়সা দাম কম পড়ত। কাটরায় কাটরায় ঘুরে কোথায় কোন্ চিজ সুবিধেয় পাওয়া যায়, তা খুঁজে বেড়াত। গো-মহিষদের জন্যে খড়-ভুষি জোগাড় ক'রে নিয়ে আসত। ভাবত, এইভাবে টেনে-কষে চালাতে চালাতে সব ঠিক-ঠাক হয়ে বুঝি যাবে। ছেলেদের এই মতি-গতি দেখে কৃপারাম কেশবতীকে একদিন বলে বসল ঐ কথা। কথাটা শুনেই রাজারাম চাজা

হয়ে উঠল, আর তার তিন দিনের দিন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গড়াতে গড়াতে চলে এল এই এত দূরে। কার কখন কোথায় যেতে হয় বলা শক্ত। এতদূরে সে কখনো এসে পড়বে, আগে সে তা ভাবে নি। এখান থেকে আবার কোথায় গিয়ে সে পৌঁছবে তা-ও তো বলা যায় না।

এতক্ষণে রাজারাম মাথা নাড়ল, বলল, ঠিক।

—কি ঠিক।

—না মরে কেউ ছাড়বে না।

দু'মাস কাটতে-না-কাটতে মহাদেবপুরের চেহারা বদলে গেল। চাটগাঁ নোয়াখালি পেরিয়ে নদী-নালার স্রোত ডিঙিয়ে এখানে আবির্ভাব ঘটল এ কার? গোলা ঝাড়া দিলেও ধানের কণা ঝুরে পড়ে না একটাও। দেদার টাকা ঢাললে দুসের-পাঁচ সের চাল জোগাড় করা হয়তো যায়। এটা মহাপাত্রের অভিশাপ বলে হঠাৎ মনে হল সকলের। লোকটা বুঝি ডাইন হয়েছে। ওর চাল-চলন আদব-কায়দা সবই বদলে গেছে হালে। একটা মারাত্মক অভিশাপের মত সে যেন টহল দিয়ে বেড়ায় সারা গাঁ। ঘরে ঘরে কড়া নাড়া দিয়ে বলে, বেঁচে আছ তো?

তার জিজ্ঞাসার নমুনাই বদলে গেছে, বেঁচে আছ মানে? না বাঁচবার জন্যে কি তারা এতদিন ধ'রে মজুত করেছে? বালিশের খোলে ভরতি করে রেখেছে তারা টাকা। পরোয়া কি? টাকা থাকলে আর কেয়ার কিসের? রামেশ্বররা জটলা করে।

কড়া শেকল দিয়ে এই বিকট দৈত্যটাকে এতদিন কোথায় যেন বেঁধে রাখা হয়েছিল, সে শেকল ছিঁড়ে সে এখন এই গাঁয়ে গাঁয়ে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই অশরীরী আত্মাটার সঙ্গেসঙ্গে গড়াতে গড়াতে

চলে আসছে মানুষ, মানুষের পাল— ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ। রাতারাতি চেহারা বদলে যাচ্ছে সবার। মহাপাত্রের চোখেও এসব আশ্চর্য ঠেকে। আশঙ্কা তাঁর ছিল। কিন্তু যা সত্যিই এল, তার চেহারা যে এমন ভয়ানক তা তিনি কল্পনা করেন নি।

নিতাই পোদ্দার বলল, রিলিফের ব্যবস্থা করতে হয়। মাঠে-ঘাটে লোক মরে মরে যাচ্ছে যে, যোগেশবাবু।

—রিলিফ? এর আবার রিলিফ কি? এর ওষুদ কোথায়?

—তবু!

দূরে সড়কের ধারে ভিড় জমেছে একটা। নিতাই বলল, আসুন. দেখে যান। খাবি খাচ্ছে, মশাই, খাবি খাচ্ছে।

—দেখেছি। মহাপাত্র উল্‌টো পথে হাঁটা দিয়ে চলে গেলেন।

রামেশ্বরদের কথাই তবে বুঝি ঠিক। লোকটা আর মানুষ নেই তবে। একেবারে খতম হয়ে গেছে। বিপিনও সেদিন বলছিল বটে এমনিধারা কথাই। নিতাই ভিড়ের দিকে চলে গেল।

একটা লোক কি-যেন খাচ্ছে। মাঝপথে থমকে দাঁড়াল নিতাই। একটু ঝুঁকে উঁকি দিয়ে দেখে সে হাসল। চালকুমড়ো। কাঁচা চালকুমড়ো চিবচ্ছে। দাঁড়াল না নিতাই।

সেপাইদের তাঁবুতে হল্লা থামে নি। কিষ্টপুরীর ক্যাম্পে টাইগারের দাপট সমানে চলেছে। রাজারামের আর ভালো লাগছে না। এদেশ ছেড়ে এখনই তার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে কত ভাবে বদলে গেল তার চোখের সামনে এই গাঁ। যা ছিল সবুজে সবুজ, তা হল ইঁট-পাথর-লোহা-লক্কড়ে কালো আর কঠিন, যা ছিল ফল-ফুলুরি আর ধান-চালের গোলা, তা হল আজ খোলামকুচির শামিল।

—কোথায় চললে, মানিক।

—চাল কিনতে। ঘুরে এলাম ওদিকে, পেলাম না।

মানিক চলে গেল। রাজারাম না হেসে পারল না। মানিকের হাতে ছোট একটা চটের থলে। কত চাল আর ধরবে ওতে? পাঁচ সের, মেরে-কেটে দশ সের। এই সামান্য একটু চাল কেনার জন্যে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছে। মহাপাত্রর কথা তারা আদপে শুনলই না। কিন্তু সে কথা ভেবে অনুশোচনার সময় তো এখন নয়। তাদের স্টোরে তো চাল আছে, লাহিড়ি দু-পাঁচ সের করে তো বেচতে রাজি আছে — অবশ্য দরে পোষালে।

মানিক চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে রাজারাম সেই পথে হাঁটতে শুরু করল। সে কোথায় চলেছে তা সে জানে, তাই পথ তার ভুল হল না। সোজা সে এসে দাঁড়াল রামেশ্বরের দরজায়।

রামেশ্বর মানিককে ধমকাচ্ছে, এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে সে। কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর বুকে বল নিয়ে সে ঢুকে পড়ল অন্দরে। একদিন তো সে ওই দাওয়ায় গিয়ে বসেছিল, সেদিন মহাপাত্র ছিল সঙ্গে। আজ সে একা ব'লেই ভিতরে যেতে তার মানা হবে কেন?

সিঁড়ির উপর জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল লবঙ্গ। লবঙ্গই বুঝি ও, পরনে আজ খড়কে-ডুরেটা ওর নেই। চেনা লোক দেখে লবঙ্গ উঠে ঘরে চলে যাচ্ছিল, রামেশ্বর ফিরে তাকাল।

রাজারাম মানিককে ডাকল, বলল, ডাকতে এলাম। চাল আমি জোগাড় করে দিচ্ছি।

—দর কত?

—যা দর, তাই। চল্লিশ।

রামেশ্বর বলল, কতটা? মণ দুই দেবে?

—অত না। অত কোথায় পাব? সের পাঁচেক।

দমে গেল যেন সবাই। দমেই হয়তো থাকত, কিন্তু সুখদার ইশারায় রামেশ্বর রাজি হল।

আর দাঁড়াল না রাজারাম। মানিককে সঙ্গে নিয়ে তখনই সে চলে গেল।

বাইরের চালের গোলার পাশের লাউয়ের মাচাটা শূন্য। লতাগুলো শুকিয়ে উঠেছে, পাতাগুলো কুঁচকে লালচে হয়েছে। সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে রাজারাম মেটে রাস্তা ধ'রে মানিককে সঙ্গে নিয়ে সিধে চলে গেল।

খেঁকিয়ে উঠল সুখদা, দুই মণ! দুই সের হলে যার আথায় হাঁড়ি ওঠে, তার অত খাঁকতি কিসের?

রামেশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার মনে হচ্ছে, একটা ভেলকি-বাজি হয়ে গেল। এক টোকায় সব গেল ভেস্তে ভণ্ডুল হয়ে গেল। কত শখ ছিল তার, সব এমন গোলমাল হয়ে গেল কেন, কিছুতেই যেন বুঝে উঠতে পারছে না সে।

তবু তামুক টানতে হয়, এক বেলা পেটে দানা না পড়লেও হয়তো চলে, কিন্তু একটু ধোঁয়া না নিলে চোখে সব যেন ধোঁয়া ঠেকে।

আরো একটা মাস টেনে-কষে চলে গেল। কিন্তু আর বুঝি চলে না। চালের দরকার রোজ দুবেলা, তাই রাজারামের কাছে গিয়ে থলে হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয় মানিককে।

সুখদা কি বলে আশীর্বাদ করবে লোকটাকে, লবঙ্গ কি করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, ভেবে পায় না তারা। দাওয়ায় মুখোমুখী

বসে চুপচাপ থাকে রামেশ্বরের সংসার। বীজ-ধানটা রাখলেও চলতো। তাও বেচে দিল রামেশ্বর।

সারা গাঁ ছন্নছড়া হয়ে গেল। রোগে ভুগে-ভুগেও যদি এই গাঁয়ের কোথাও এর আগে একটা প্রাণী মরত, তাহলে সারাটা গাঁ গিয়ে সেখানে জড়ো হত। এখন মড়া দেখেও কারো ভয় নেই। পথে-ঘাটে রোজ কতজন মরছে, কে তার খোঁজ করতে যাবে।

এককালে ছিল বটে মহাপাত্র, এখানকার সহায়, সকলের সম্বল। কিন্তু এখন তিনি তাঁর শ্যাওলা-পড়া নুনে-খাওয়া জীর্ণ বাড়িটার এক কোণে লুকিয়ে বসে আছেন। এখন একমাত্র সহায় তাদের রাজারাম। যেখান থেকে হোক, যত দাম দিয়ে হোক, চাল জোগাড় করে সে এনে দিচ্ছেই।

মনের কোন্-এক কোণে একটা ছোট দাগ যেন পড়েছে। সে দাগটা মুছছে না কিছুতে, দিনে দিনে তা যেন আরও দেগে বসেছে। রাজারাম দেখে, পরনে তার অন্য শাড়ি, কিন্তু হাতে তার সেই রুপোর বালা, নাকে সেই ছোট নাকছাবি।

প্রত্যহ সে আসে, প্রত্যহ সে দূর থেকেই একবার চেয়ে দেখে মাত্র।

মালা এসে বলল, বাবা পাঠালেন। আমাদের বুঝি দেবে না চাল?

সুখদা বলল, না দেবার কি আছে। জোগাড় হলেই দেবে। জোগাড় করাটাই যে বিষম দায়।

লবঙ্গকে চিমটি কাটল মালা, বলল, আছিস সুখেই।

সুখেই আছে বটে। সুখের মহোৎসবই চলেছে। কিন্তু লবঙ্গ এ-চিমটিতে কোনো সাড়া দিল না, চুপ করে বসে রইল। একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল মালার দিকে।

মালা শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা, যদি জোগাড় হয়, একটু যেন ভাগ পাই আমরা।

মালার চিমটিতে চিমটিতে লবঙ্গর কেমন যেন একটা নূতন চেতনা আসতে লাগল ভিতরে। কথাটা কি সত্যিই তবে ঠিক? হতেও পারে-বা। মাঝে-মাঝে রাজা কেমন চোখে যেন চায় তার দিকে, সে চাওয়ার সত্যি কিছু মানে আছে কি না আজ থেকে লবঙ্গ যেন তা খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু এই দুঃসময়ে কেন? যখন সুখ ছিল, শান্তি ছিল, বিরাম ছিল, বিশ্রাম ছিল— তখন এই মধুর স্বপ্ন-রচনা ছিল সহজ। আজ তাকে এই কঠিন দুঃস্বপ্নটা দিয়ে গেল কেন মালা?

খালি থলে হাতে মানিক ঢুকল। পিছনে পিছনে অপরাধীর মত এসে ঢুকল রাজারাম। আজ কিছু জোগাড় করতে না পেরে রাজারাম যেন ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে, তার মুখে এমনি একটা ছাপ।

—জোগাড় হল না মানে! ডবল দাম দেব। হুংকার দিয়ে উঠল রামেশ্বর।

মানিক বলল, কোথাও নেই। কত ঘুরলাম আমরা।

কাঠের খুঁটি ধরে লবঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল, খাঁচার পাখিটা বিকট শব্দ করে উঠল, চাপা গলায় তাকে ধমক দিয়ে খুঁটির আড়াল দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে লবঙ্গ। ওই রাজারাম। মধুমালার রাজা। মালা ফাজিল হলে হবে কি, ওর পছন্দ আছে।

ময়না আবার শব্দ করে উঠতেই লবঙ্গ বলল, আর আটকাব না তোকে। এবার ছেড়ে দেব। বন-বাদাড়ে উড়ে যাবি।

ময়না অবিকল নকল করে বলল, কোন্ পাহাড়ে উড়ে যাবি?

লবঙ্গ সাড়া দিয়ে বলল, যেখানে খুশি।

ধানকোড়ার ক্যাম্প এখান থেকে অনেকটা দূর। রোদ এখন বড় কড়া। রাজারামের নাওয়া খাওয়া হয় নি এখনো। কিন্তু খাওয়ায় তার রুচি যেন তেমন নেই। এ বাড়ির এতগুলো লোক এখন কি করবে

তাই সে ভাবছিল, আর রোদের দিকে চেয়ে তার ওঠার উৎসাহ কমে আসছিল। লঙ্গরখানা কয়েকটা বসেছে কিছুদিন হল। সেখানে খিচুড়ি বিলি করা হচ্ছে। এ কথা তো সবারই জানা, রামেশ্বরও। কিন্তু লোকটা অমন নিস্তেজ হয়ে বসে আছে কেন? একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হবে। রাজারাম কথাটা নিজে তুলতে পারছে না।

রামেশ্বর বলল, ডবল দাম দিয়েও পাওয়া যাবে না? এ কী রকম জুলুম?

রাজারাম জবাব দিল না। তার মনে হতে লাগল এখানকার আবহাওয়াটা কেমন যেন ঘোরালো হয়ে উঠছে। সে একবার উঠবার জন্য ঝোঁক দিল। রামেশ্বর আড়চোখে তার দিকে তাকাল মাত্র, বাধা দিল না। সুতরাং উঠতে হল তাকে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে বাধা পেল। উগ্র চোখ আর রুক্ষ মূর্তি, কে এই মেয়েটা?

পথ আটকে শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে মধুমালা বলল, তোমার নাম তো রাজা? বাবা তোমাকে ডাকছে।

ওর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলো রাজারাম, বলল, কে ডাকছে?

—কৌশিক হাজরা? চেনো না? এই পথ পেরিয়ে ওই যে সাঁকো, তার ওপারে। সেই যে কাজরি গেয়েছিলে?

ডবল দাম দিতে চায় রামেশ্বর, কৌশিক যেন দিতে চায় তার চেয়েও বেশি— মধুমালা এমনি এক ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করে বলল, আসবে না?

জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল। মালা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল দু পায়ে ধুলো উড়াতে উড়াতে রাজারাম চলে যাচ্ছে, একবারও পিছন ফিরে চেয়ে দেখছে না। মানুষের খিদে বোঝে না, লোকটা কি পাথর?

গলার স্বর শুনে ছুটে দেখতে এল লবঙ্গ। মধুমালা যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি রে, মালা? হল কি?

মালা ক্রুদ্ধ চোখে একবার মাত্র তাকাল লবঙ্গর দিকে। জবাব দিল না। যে-পথে সে এসেছিল, সেই পথে সে চলে গেল। তার যাওয়ার তাগাদা যেন কিছুমাত্র নেই, এমনি সহজ গতিতে সে চলে গেল।

মালার রকম দেখে ভালো লাগল না লবঙ্গর। কার সঙ্গে সে কথা বলছিল, তা জিজ্ঞাসার আর কি দরকার। ওই তো, এখনো তাকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, জামগাছের ধার ঘেঁষে পায়ের সঙ্গে নিজের ছায়া টেনে টেনে ওই তো চলে যাচ্ছে সে।

লবঙ্গর বুকের মধ্যে কে যেন শব্দ করে কপাট বন্ধ করল— ভীষণ শব্দ সেটা, ভয়ঙ্কর শব্দ। সে ডাকল গলা ছেড়ে, গলা ছেড়ে সে ডেকে উঠল মালাকে। রাজারাম যাক, মালা যদি এখন ফিরে আসে তাতেও তার এখন অনেক লাভ— এমনি বোধ হল লবঙ্গর। দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার সে ডাকল মালাকে। কিন্তু সেও ফিরল না।

এর পর দু দিন কাটল। মালাও নাইতে এল না, রাজারাম এল না। থলে হাতে নিয়ে মানিক কয়েকদিন ধরে রাজারামের কাছে যাচ্ছিল, সেও যাওয়া বন্ধ করেছে। কোথায় কি-একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে তা হলে।

ধানকোড়ায় বসে বসে রাজারামেরও মনে হয়, কি-একটা গোলমাল হয়ে গেছে। মানিক আর আসছে না। সেদিন কিছুতেই কোথাও কিছু পায়·নি ব'লে কোনোদিনই কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না কেন। মানিকদের এভাবে হাল ছেড়ে দেবার কারণ সে বুঝতে পারছে না। সে নিজে তো দিব্যি আছে। শান্তনু লাহিড়ির চাকরি করে, তার

খাওয়ার ভাবনা তার নিজের নয়— শাস্তমুর। পরের ভাবনায় ভর করে তার চলে যাচ্ছে কোনো গতিকে। নিজের পুঁজি-করা সেই ভাবনাটা সে খরচ করছে মানিকদের নিয়ে।

লঙ্গরখানায লঙ্গরখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে টাইগার। পাড়ায় পাড়ায় টহল দিচ্ছে পল্টন। কিন্তু তাদের মতিগতি ভালো না। মানুষ বেকায়দায় পড়লে বাগে আনতে কতক্ষণ। সেপাইদের মতিগতি দেখে ভয় পায় রাজারাম। এক মুঠো চানা দিয়ে দু মুঠে বাগিয়ে ধরার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে সেপাইরা। চারদিকে হাহাকার যত বাড়ছে, এদের হল্লা হয়তো সেইজন্যেই বাড়ছে সেই অনুপাতে।

গাঁয়ের নতুন আতঙ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে টাইগারও। রাজারাম দেখে, ভয়ে তার প্রাণও উড়তে থাকে। টাইগারকে ভয় নয়, ভয় ওই হাতিয়ারটাকে। নেশার ঝোঁকে. ওটা উঁচিয়ে ঘোড়া টিপে দিতে কতক্ষণ।

দিন দুই সে যায় নি। কিন্তু আজ সে যাবে। আবার সেই মেয়েটা পথ রুখে না দাঁড়ায়। কোনোদিন আচমকা কোনো সেপাইয়ের সঙ্গে অমন ভঙ্গি যদি করে বসে ও, তা হলে আর ইজ্জৎ নিয়ে ফিরতে হবে না।

রামেশ্বরের বাড়ির মধ্যে সরাসরি ঢুকে পড়ল রাজারাম। লোকজন কেউ নেই। একেবারে ফাঁকা বাড়ি। ছোট গোলাটার চারপাশ সে ঘুরল, এদিক-ওদিক চেয়ে বারান্দায় উঠল। ঘরেও উঁকি দিল, কাউকে দেখল না কোথাও। মাথায় কি-যেন ঠেকল। খাঁচা। খাঁচার দরজা খোলা। পাখিটা তবে বুঝি ভেগেছে। ঘর-দোর এভাবে খোলা রেখে এরা গেল কোথায়, দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে বসে ভাবছে রাজারাম।

এমন সময় বাইরে কাদের গলা শুনতে পেল। গলা শুনেই উঠোনে নেমে এল সে। দরজার দিকে এগতেই দেখল রামেশ্বরকে, তার পিছনে মানিকরা।

—কোথায় গিয়েছিলেন ?

রামেশ্বর সাড়া দিল না, মানিক বলল, খেতে। লঙ্গরখানায়।

ভালো। উত্তম।

ধানের জাহাজ নোঙর করা ছিল যার উঠোনে, সে খানা খেয়ে এল লঙ্গরখানায়।

—খিদে পেলে বাঘেই শুধু ধান খায় না, মানুষেও গোরুর খৈল খায়, রাজারাম। নিজের চোখে দেখা। রামেশ্বর দাওয়ায় বসতে বসতে বলল।

রাজারাম এ কথা জানে, এটা আর বড় কথা কি ? দু হাতে নিজের বমি ·কেচে খেতে সে নিজেই দেখেছে পরশু। সেটা দেখা এস্তোক মাথা-মগজ ঠিক নেই তার।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি তো নেইই, আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে ক্রমশ। মাঝে রাজারাম ঠিক করেছিল, সে চলে যাবে এখান থেকে। এসব দেখা তার আর সহ্যই হচ্ছে না আদপে।

আষাঢ়ের ঘনবর্ষায় সব ধুয়ে মুছে যাবে বলেই তার আশা ছিল। কিন্তু বর্ষা তার বিক্রম দেখাবার সরঞ্জাম পেয়ে গেছে যেন। নদীর জল বাঁধ উপচে গাঁয়ে ঢুকল হড়হড় করে। মাঠঘাট ডুবল, চারদিক জলে থইথই করছে। পায়ে হেঁটে যাদের লঙ্গরখানায় যেতে হত, তাদের এক-কোমর জল ভাঙতে হয়। লঙ্গরখানাগুলো এক-একটা দ্বীপের মত দেখায়।

বড় বড় মাটির গামলা ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকে লঙ্গরখানার ঘাটে। গামলায় ছেলেপুলেদের বসিয়ে মা-বাপেরা তাদের ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে আসে খিঁচুড়ি-ভোজে। এক-একটা গামলা থেকে দুটি-পাঁচটি করে বাচ্চা নামে। তাদের বাপ-মায়েরা হাঁটু-জল বুক-জল হেঁটে পাড়ি দেয়।

কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টাইগার। মাঝে-মাঝে খুচখাচ করে ছবি তুলে তুলে নিচ্ছে। সমান হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, কিন্তু ছবি নেবার সময় শক্ত হয়ে নিচ্ছে। মুচকে মুচকে হাসছে আর চারদিকে তাকাচ্ছে।

রাজারাম দাঁড়িয়ে ছিল খানিকটা তফাতে। সে চেয়ে চেয়ে দেখছিল টাইগারকে। মদে চুরচুরে হয়ে আছে, সারা প্রাণ যেন তার ফুরফুর করে উড়ছে। একটু শিস দিতে গেল, কিন্তু শিস বার হল না। টাইগারের রঙ্গ দেখছে সে, আর মনে মনে গজরাচ্ছে।

জলের ওপারে এসে দাঁড়াল রামেশ্বররা। ধীরে ধীরে জলে নেমে পড়ল তারা। এখান থেকে রাজারাম নিষেধ করার আগেই। এই জল ভেঙে না এলেও তো চলে তাদের। একটা পিতলের হাঁড়ি নিয়ে এলেই তাতে করে জন-কয়েকেরটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যেতই। কিন্তু তারা এখন একহাঁটু জলে, আগে আগে রামেশ্বর, তার পর মানিক ও এলাচ, সব শেষে সুখদা ও লবঙ্গ। রামেশ্বর এলাচকে কোলে তুলে নিল, এখানে জল এককোমর। সুখদাদের বুক পর্যন্ত। টাইগার চটপট কয়েকটা ছবি নিয়ে নিল।

ভিজে কাপড়ে পাড়ে যখন উঠছে তারা, তখন টাইগার কাছে গিয়ে ছবি তুলতে গিয়েই থেমে গেল। চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে নিয়ে সে চোখ পাকিয়ে শিস দিল একবার। গামলার জলে নিজের ছায়া

দেখার কথা একদিন লবঙ্গকে বলেছিল মালা। সেই ছায়াটা বুঝি স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়েছে টাইগারের। দু পা সে এগিয়ে গিয়ে লবঙ্গর দিকে হাত বাড়াল কেন যেন।

তার পর কার কি হল মনে পড়ে না রাজারামের। কেবল এইটুকু মনে পড়ে— চারদিকে একটা কোলাহল আর কলরব উঠেছিল, কিন্তু সেখানে আর কার কি হল তা দেখার সুযোগ তার আর ঘটে নি। কেবল তার কি হল, সেইটুকু মাত্র সে জানে। তার জীবনের কয়েকটা বছর একেবারে বাজে ব্যয় হয়ে গেল। এই মাত্র।

পুষিয়ে তাকে নিতে হবে সব-কিছু, ওয়াশিল করে নিতে হবে লোকসান। তা না হলে আর এ বাঁচাটার মানে থাকবে কী। টাইগার খতম না হয়ে সে যদি খতম হয়ে যেত তা হলে তার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন জীবনকে মনের মত করে আবার গড়ে নেওয়াই উচিত। উৎসাহ আর উদ্দীপনা বলতে যা বোঝায় তা তার আছে, আশা আর ভরসা বলে যে দুটি কথা আছে তাও সে নিজের ভিতরটা একটু হাটকালেই পায়। তাই তার চলার গতি ঢিলে হয়নি। বড় বড় পা ফেলে সে এখন তাই চলেছে একটানা।

বড় বড় পা ফেলে চলেছে রাজারাম।

শিবলার সীমান্ত পার হয়ে ঢালুতে নামা মাত্র আমাদের চোখের সামনে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেকটা পথ সে পার হয়ে গেছে। এখনো সে চলেছে একটানা। বাইনাজুড়ি কিষ্টপুরী সে

পার হয়ে গেছে। ধানকোড়া ডিঙিয়ে সে চলেছে এখন। সে এখানে ছিল এককালে, কিন্তু এখন জায়গাটা চেনা যায় না। কুলিদের জন্যে তার কোম্পানি যে ক্যাম্প করেছিল, তার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। বড় বড় দু-চারটে গাছ, দু-এক ফালি মাঠ চেনা-চেনা লাগে বটে। সে চলেছে মহাদেবপুরে, কিন্তু যাদের জন্যে সে এতদিন বাদে ছুটে চলেছে তারা টিকে আছে কি না সে জানে না। দুর্ভিক্ষের সেই ধাক্কায় সাফ হয়ে গেছে কি না তারা, বলা শক্ত। না টেকারই কথা, যদি টিকে গিয়ে থাকে সেইটেই আশ্চর্য অবশ্য।

মহাদেবপুর যতই কাছিয়ে আসছে ততই তার গতি দ্রুত হবার কথা, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতি ঢিমিয়ে আসছে। তার সংকোচ হচ্ছে। মাথায় একবার হাত বুলালো রাজারাম। তাকে দেখে ওরা নিশ্চয় চমকাবে। সত্যিকারের খুনীর মতই তাকে দেখতে-হয়েছে নিশ্চয়।

এতটা পথ সে হাঁটল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে দেখা হল খুব কম। তার হাতে-গড়া পাকা সড়কটা এরই মধ্যে ভেঙে গেছে। সে পালিশও নেই, সে ঝক্‌মকানিও নেই। যে যে মাঠে তাঁবু পড়েছিল, সেখানে এখন জায়গায়-জায়গায় টুকরো-টাকরা খুঁটি দেখা যায় মাত্র।

সন্ধ্যা নেমে এল মহাদেবপুরের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র। রাজারাম একবার থমকে থেমে চারিদিকে তাকাল। এইখান থেকে বসেছিল সার-সার স্টল। কয়েকটার কাঠামো এখনো দাঁড়িয়ে আছে— কঙ্কালের মত দেখাচ্ছে অবিকল। চারদিক যেন থমথম করছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে। দূরে কাছে কোথাও একটা আলো দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা হল, তার সাড়া কই। আগে-না শাঁখ বাজত এখানে, সন্ধ্যা হলে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠত। সারা গাঁ তবে কি সত্যই সাফ হয়ে গেছে। চোখে সে দেখছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না আদপে।

পাকা রাস্তাটা ছেড়ে মেটে রাস্তা ধরে চলল রাজারাম। রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আগাছা। দু পাশ থেকে গাছ ঝুঁকে পড়েছে পথের উপর। হাত দিয়ে আগাছা সরাতে সরাতে রাজারাম এগিয়ে চলল। সে যেন সাঁতার দিচ্ছে। জলের অরণ্য পার হয়ে এল বিনা-সাঁতারে, এখন এই গাছের অরণ্যে দু হাত টেনে টেনে সাঁতার দিতে হচ্ছে তাকে। ছোটখাট গাছের মাঝখানে জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই জামগাছটা। খসখস শব্দ হচ্ছে দুপাশে। রাজারামের ইচ্ছে হল, এইখান থেকে একবার গলা ছেড়ে সে ডাকে রামেশ্বরকে, নাহয় মানিককে। কিন্তু ডাকল না। এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল রামেশ্বরের বাড়ির সামনে। বেড়া নেই। বাইরের গোলাটা বেঁকে পড়ে আছে। ভিতরে যাবার দরজাটা হাট করে খোলা। ভিতরে ঢুকবার আগে রাজারাম একবার ডাকল মানিককে, দু বার ডাকল, তিন বার। সাড়া পেল না। তখন সে সরাসরি ভিতরে চলে গেল। কেউ নাই কোথাও। ঘর-দোর সব ভেঙে গিয়েছে। করোগেটের টিন ছিল বলে তার মনে পড়ে, কিন্তু চাল এখন খালি।

রাজারাম দাঁড়াল না। মস্ত ধাক্কা পেল সে। কিন্তু এই অরণ্যে রোদন করে লাভ কি? সেখান থেকে বেরিয়ে সে সটান চলল কৌশিকের বাড়ির দিকে। সন্তর্পণে সাঁকোটা পার হয়ে সে কৌশিকের বাড়ির কাছে গিয়ে দেখল জানালার ফাঁক দিয়ে একটু আলো দেখা যাচ্ছে।

রাজারাম ডাকল, কৌশিক, কৌশিকবাবু।

ভিতর থেকে খকখক কাশির আওয়াজ এল। শব্দ পেয়ে রাজারাম আবার ডাকল।

একটু বাদে কুপি হাতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল থুত্থুরে এক বুড়ি। বলল, ডাকে কে?

রাজারাম বলল, কৌশিকবাবুকে ডাকছি।

—তারা নাই। কুপিটা হাত থেকে পড়ে নিবে গেল, অন্ধকারের মধ্যে থেকে কি-সব বলে গেল বুড়িটা, তার একটা কথাও বুঝতে পারল না রাজারাম।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার পর ফিরল রাজারাম। কিছু-একটা গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও, টের সে পাচ্ছে এখন। কিন্তু সে ঢুকে পড়েছে এক ঘনবনের মধ্যে, এখান থেকে বেরিয়ে আসবার পথ পেলে হয়। সাঁকোর উপর উঠে সে তাকাল একবার গাছের ফাঁক দিয়ে রামেশ্বরের বাড়ির দিকে, কিন্তু কিছু দেখা গেল না। ঝিঁঝিঁপোকার একঘেয়ে বাজনা বাজছে চার ধারে। আর জ্বলছে জোনাইপোকা দপদপ করে। রাজারামের বুকের ভিতরটা ঠিক অমনি করেই কাঁপছে। সব আলো আজ যেন নিবে গেছে, এই আলোর বিন্দুরাই এখন তার সহায়। এই আলোতে ভর করে সে এগতে লাগল।

ইতিমধ্যে রাত কত হয়ে গেছে সে জানে না। চারিদিকে শেয়ালের কলরব শুরু হয়ে গেছে। তারা ডেকে ডেকে রাজারামকেই যেন জিজ্ঞাসা করছে— হল কি। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা। কিন্তু এর কোনো জবাব নেই। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে রাজারাম চেনা পথ পেয়ে গেল। এই সেই পুকুর। শাপলা আর কলমির জঙ্গলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে রাজারাম চলেছে। সামনে প্রেতের মত বীভৎস একটা অন্ধকার মূর্তি ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে ওই সিংহদ্বার। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে সর্‌সর শব্দে পালিয়ে গেল শেয়ালই হয়তো, কিংবা সরীসৃপ।

রাজারাম চলে এল ভিতরে, গলা পরিষ্কার করে নিল। কিন্তু ডাকতে গিয়ে সে থেমে গেল। কেউ যখন নেই কোথাও, ইনি কি আর আছেন!

মনে হয় না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রাজারাম বলল, মহাপাত্তরবাবু আছেন ?

চারিদিক থেকে ব্যঙ্গ বেজে উঠল, রাজারামের গলার স্বর অবিকল নকল করে একটা গুম্‌গুম আওয়াজ হল। প'ড়ো বাড়িটার হাড়ে-হাড়ে সেই শব্দ ঠকঠক করে বাজল একটু।

সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়েও আবার একধাপ উঠল রাজারাম। এমন সময় ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, ডাকে কে ?

বহুদিন বাদে নিজের নাম শুনে মহাপাত্র উঠে বসলেন, খড়ম পায়ে দিয়ে খটখট শব্দে বাইরে এসে দেখেন একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে।

—কে ?

—আমি রাজারাম।

রাজারাম ? প্রথমটা বিশ্বাস হল না মহাপাত্রের। এত দিন বাদে ঐ নামটা তাঁর কানে বিষম আকস্মিক মনে হল। এক পা এগিয়ে বললেন, কি বললে ? রাজারাম ?

রাজারাম এগিয়ে আসতেই দু হাত বাড়িয়ে মহাপাত্র তাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, জেল থেকে পালিয়ে নাকি ? এস এস, ঘরে এস।

হারিকেন ঝাঁকি দিয়ে দেখলেন, তেল নেই। মাটির পিদিমটা চটপট জ্বাললেন মহাপাত্র। কাঠের পিলসুজটা একটু কাছে টেনে এনে রাজারামের পাশে বসে বললেন, তার পর ? ভুলতে পার নি দেখছি। এখন কোত্থেকে আসছ ?

—বেরিলি।

—এত শিগগির ছাড়া পেলে ? এর মধ্যে দশ বছর হয়ে গেল নাকি ?

রাজারাম বলল, পালাই নি, আগাম খালাস পেলাম। আদ্দেক মাপ হয়ে গেছে।

চুল-দাড়ি সমেত মস্ত মাথাটা নাড়তে নাড়তে মহাপাত্র হাসলেন, বললেন, বুঝতে পেরেছি। আজাদ হবার বখশিশ।

রাজারাম হেসে বলল, হ্যাঁ। ছাড়া পেয়ে ছুটে এলাম দেখা করতে। কিন্তু কেউ নেই এখানে। কাউকে দেখলাম না। সবাই সাফ হয়ে গেছে নাকি ?

জবাবটা শোনবার জন্যে সে উৎকর্ণ হয়ে বসল। মহাপাত্র নিশ্বাস ফেলে বললেন, সাফ! সব হাওয়া হয়ে গেছে, রাজারাম। সব চলে গেল। আমার মানা তারা মানল না।

—কোথায় গেল ?

—জানি নে। ভিটে আর দেশ ছেড়ে তারা চলে গেছে। দেশটাও ভেঙে গেল, তারাও তাদের ঘর ভাঙল। গাঁয়ে আর লোক নেই।

রাজারাম ঠিক যেন বুঝতে পারল না। প্রদীপের আলোয় তার দুটো চোখ চকচক করতে লাগল শুধু। অপলক চোখে সে চেয়ে বসে রইল মহাপাত্রের দিকে। মহাপাত্র গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবছেন।

রাজারাম বলল, কেউ নেই, তাই দেখলাম।

—থাকাও অবশ্য কঠিন ছিল। কিন্তু ভিঁটে কামড়ে পড়ে থাকা দরকার ছিল, রাজারাম। তারা বুঝল না, চলে গেল।

—কোথায় গেল তারা ? রাজারাম আবার জিজ্ঞাসা করল।

মহাপাত্রও আগের মতই বললেন, জানি নে। এক-এক দল এক-এক দিকে চলে গেছে। দুর্ভিক্ষের ধাক্কাটা প্রায় সামলে নিয়েছিল সকলে। গুছিয়ে-গাছিয়ে একটু বসবে এমন সময় এল সেই মহাদিন—এল স্বাধীনতা। কিন্তু জানো তো, গোলাপেও কাঁটা থাকে, রুপোলি ঝর্নার নীচেও থাকে পাঁক। আমাদের স্বাধীনতা এল দেশকে তিন টুকরো করে কেটে দিয়ে। ভিটে-মাটি ছাড়তে হল গাঁয়ের লোকদের,

না ছেড়ে উপায়ও অবশ্য ছিল না। এই অনাচার আর অবিচার বরদাস্ত করা শক্ত।

মহাপাত্র বলে যাচ্ছেন, কান পেতে শুনছে রাজারাম। কিন্তু তার মন হয়ে গেছে উধাও। কোন্‌খানে দেশ ভাঙল, কোথায় কি অবিচার অনাচার হল— কিছুই সে জানে না। মস্ত উঁচু প্রাচীরের আড়ালে সে কাটিয়ে এসেছে পাঁচটা বছর। বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটল, তার খোঁজও করে-নি সে, কিছু জানেও না। জানবার আগ্রহও তার হয় নি। কেবল তার মনে হত, কবে সে ছাড়া পাবে। কবে প্রাচীরের বেড়ার ওপারে গিয়ে দাঁড়াতে সে পারবে।

মহাপাত্রের কাছে বসে বসে সে সব শুনল। যত শুনছে ততই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে সে। নিজেকে যেন তার বেকুব মনে হচ্ছে। সে এতদিন তবে বুঝি এ পৃথিবীর মানুষ ছিল না। তার পৃথিবীটা ছিল একটা আলাদা জগৎ। সেখানকার মানুষেরা বাইরের পৃথিবীর মানুষের থেকে একেবারে অন্যরকমের। পাঁচটা বছর সে কাটিয়ে এসেছে সেই এক ভয়ানক নরকে।

মহাপাত্র বললেন, সব চলে গেছে, রাজারাম। কিন্তু আমি এখানে বসে আছি প্রহরীর মত। এখান থেকে আমি কখনো নড়ছি নে।

প্রদীপের পল্‌তেটা উসকে দিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে দেখতে এখন সত্যিই খুনীর মত হয়েছে। খুন না করেও খুনের অপবাদ দিলে এমনি প্রতিশোধই নিতে হয়। চেহারাই পালটে ফেলেছ।

রাজারাম মাথা নাড়ল, বলল, অমনভাবে আটক করে রাখলে মাথায় খুন আপনি চেপে যায়, মহাপাত্তরবাবু। আর সঙ্গীসাথীরাও তো কম ওস্‌কায় না, কম রকমারি লোকের সঙ্গে তো দিন কাটাতে

হয় না! ওখানে যারা থাকে তারা মানুষ না, মানুষের গাদ। গাদ জমিয়ে রাখলে তা পচে ওঠেই।

—ঠিক। জেলের কথা আর শুনতে চাই নে, পনর বছর জেল চেখে দেখেছি। অন্য কথা বল। বাপ-মা-ভাই-বোনের খবর-টবর জানো ?

মাথা নেড়ে রাজারাম বলল, জানে না। মহাপাত্র তাকে এ বিষয় আর কিছু বললেন না। পঞ্জাবও যে দুটুকরো হবার আগে রক্ত দিয়ে মুক্তিস্নান করেছে, সেকথা বলে লোকটাকে ব্যস্ত করতে তাঁর মন চাইল না।

মহাপাত্র বললেন, কৌশিক রামেশ্বর খগেন দিগম্বর একই ইস্টিমারে রওনা হয়েছে। কলকাতার আশেপাশে কোথাও গিয়েছে মনে হচ্ছে। প্রথমে এদের নাম হয়েছিল শরণার্থী, তার পর নাম হয় বাস্তুহারা, এখন এদের নাম উদ্বাস্তু। নানাভাবে ও নানা নামে উদ্ব্যস্ত হয়ে এখন হয়তো ওরা থাকবার ঠাঁই জুটিয়ে নিয়েছে একটু।

—কোথায় ?

—বললাম যে, কলকাতার আশেপাশে কোথাও। শান্তিপুর নবদ্বীপ বাইগাছি কাঁচড়াপাড়া কিংবা বেলেঘাটা বেলগাছিয়া। সরকারী ক্যাম্প বসেছে অনেক।

এত নাম, এত জায়গা। জায়গাগুলো চেনা দূরের কথা, নামই কখনো শোনে নি রাজারাম। এর মধ্যে থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব কি না, হয়তো তাই বসে বসে ভাবছে রাজারাম।

পাঁচটা বছরে এত ওলট-পালট হতে পারে, ধারণা ছিল না তার। আরও কত-কি বদল হয়েছে বলা সম্ভব নয়। লবঙ্গ কেমন আছে ? সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসবে নাকি ভাবছিল রাজারাম।

—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘর-মুখে না গিয়ে কার টানে তুমি আগেই এখানে এসে পড়েছ, রাজারাম ? আমার ?

মহাপাত্রের এই অদ্ভুত জিজ্ঞাসায় সে চমকে উঠল। প্রদীপের শিখাই বুঝি কাঁপল একটু। মহাপাত্র দেখলেন, ঠোঁটের কোণ আর চোখের পাতা কেঁপে উঠল রাজারামের।

মহাপাত্র বললেন, জানি। বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কি কথা বললেন আপনি।

মহাপাত্র গম্ভীর হয়ে বললেন, আঁতের কথা। লবঙ্গর কথা। তুমি চলে গেলে রাজারাম, তোমার লম্বা ফাটক হয়ে গেল। কিন্তু আমরা কি তোমাকে চট করে ভুলে গেলাম, ভেবেছ? গাঁয়ের প্রাণ গাঁয়ের মন অত বেইমান না। তুমি ভেবেছ, তুমি গোপন রেখেছ, কিন্তু কোন্ ফাঁক দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে টেরও পাও নি, কেমন?

মহাপাত্র মাথা নাড়তে লাগলেন, বললেন, আমার দিক থেকে এতে আমি সায়ই দিই, রাজারাম। বাধা দেবার লোকও কিন্তু আছে অনেক। আশ্চর্য লাগছে হয়তো শুনতে। বড় মুখে ছোট কথা শুনছ বোধ'য়। কিন্তু এককালে আমাদেরও বয়স ছিল, আমাদেরও শখ ছিল। কিন্তু থাক সে কথা। এই রাতে পথ ঠিক পেলে কি করে?

রাজারাম জবাব দিল না।

—একবার দেশ থেকে ঘুরে এস। তার পর—

—তার পর কি? রাজারাম মাথা নীচু ক'রে ছিল, মহাপাত্রের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

মহাপাত্র বললেন, তার পর তুমি একটা পথ বেছে নেবে।

বাইরে প্রবল কলরব করছে শৃগালের পাল। রাজারাম মাথা নেড়ে মনে-মনে বলছে, কিছু না, কিছুই হয় নি তার।

অনেক রাত অবধি দু জনে কথা বলল। সমস্ত গ্রামের ইতিহাস, সমস্ত লোকের ইতিকথা। খগেনের একটিমাত্র ছেলে, দিগম্বরের

ছেলেপুলে কিছু নেই, কৌশিকও মেয়ের দায় থেকে খালাস, ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে বেশি রামেশ্বরের। এলাচও বড় হয়ে উঠেছে, লবঙ্গ তো হয়েইছে, এই দুই মেয়ের দায়, তার উপর মানিক; এতগুলো প্রাণীর পেট ভরানোর সমস্যা তো কম নয়। কিন্তু ভাগ্য তার কিছুটা ভালোই বলতে হবে, মেয়ে-দুটি বড় বুঝদার। কৌশিকের মেয়ে তো বাপের মুখে কালি দিয়ে কোথায় ভেগেছে, নিতাইয়ের ছেলেটাকে কিছুদিন নাচাল—তার পর হাওয়া।

মনে পড়ে বটে রাজারামের, মেয়েটাকে সে দেখেছে। একদিন তার পথ আটকে সে দাঁড়িয়েছিল।

—খিদে যে সইতে পারে না, রাজারাম, তাকে মানুষ বলি কি করে? আর খিদে কি ওর একার? বাড়িসুদ্ধ সবাই তো খিদেয় ধুঁকছে তখন।

আর কিছু জানার আগ্রহ হল না রাজারামের। প্রদীপটা নিভে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে সে ভাবছে লবঙ্গর কথা। কৌশিকের মেয়ের কথা না ব'লে মহাপাত্র যদি তার কথা বলেন, তবে সে সাগ্রহে শুনবার জন্যে তৈরি হয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু মহাপাত্র আর-কিছু বললেন না, নিশ্বাসপাতের শব্দ শুনে বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়েছেন। পাশ ফিরে শুল রাজারাম।

পরদিন মহাপাত্র বললেন, চলে যাচ্ছ, কিন্তু যাবার আগে তোমার চেনা গাঁ-টা দিনের আলোয় দেখে যাও একবার। এস।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ওই তার সড়ক, ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে পাশে ছন্নছাড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে স্টলের কঙ্কাল। লঙ্গরখানাগুলোর আর-কোনো চিহ্ন নেই। টাইগারের বুটের দাগে দাগে চিহ্নিত হয়েছিল এইখানটা, সে দাগ এখন মুছে

গেছে। দিনের আলোয় দেখে এল কৌশিকের আর কেশবের বাড়ি, দেখে এল রামেশ্বরের ঘর। একটা প্রচণ্ড ঝড়ে সব শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে বোধ হয়। হাঁ হয়ে পড়ে আছে ঘরগুলো, মাথার উপর থেকে টিন খুলে নিয়ে গেছে কারা। পাকা সড়ক ডিঙিয়ে ইটের ভাঙা খোলাটার পাশ কাটিয়ে মাঠ ভেদ করে চলল দু জন। একটু চড়াই, উঠেই চোখে পড়ল থইথই জল— পদ্মা। শিবমন্দিরটা পাক খেয়ে মহাপাত্র বললেন, কেমন লাগছে, রাজারাম।

—ভালো। দেশের নদীর কথা মনে পড়ে। চন্দ্রভাগা, বিপাশা—

বাধা দিয়ে মহাপাত্র বললেন, নেমে এস।

রাজারাম তাঁর সঙ্গেসঙ্গে নামল। জলের কাছ-বরাবর গিয়ে মহাপাত্র বললেন, ব'সো। এইখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, আজ এইখানেই শেষ আলাপ করি।

অর্থাৎ? মুখ তুলে রাজারাম মহাপাত্রের দিকে তাকাল। মহাপাত্র বললেন, স্টিমার ছাড়বে বিকালে, সময়টা তো কাটাতে হবে।

রাজারাম হঠাৎ অনুনয়ের স্বরে বলল, আপনিও চলুন।

—কোথায়? উদ্বাস্তু হতে? বেশ আছি। আর-কটা মাত্র দিন তো। এইখানেই কেটে যাবে।

—কিন্তু কেউ যে নেই এখানে!

—কেউ নেই কি রকম? প্রতিবাদ করে উঠলেন মহাপাত্র, আমি কি কেউ নই? সারা গাঁ আমাকে মানে না ব'লে তুমিও গ্রাহ্য করতে চাও না রাজারাম?

রাজারামের পিঠ চাপড়ালেন মহাপাত্র। বললেন, কিছু নেই বটে, কিন্তু শ্মশান তো আছে।

মানে বুঝতে পারল না রাজারাম, মহাপাত্রের মুখের দিকে তাকাল।

মহাপাত্র বললেন, দেখে এলে-না আজ মহাশ্মশান? যেখানে ছিল মানুষ, সেখানে আজ শুধু কঙ্কাল।

একটু থেমে বললেন, অনেকে আমাকে বলে আদর্শপুরুষ। শুনে হাসি পায়। আমার মত অপদার্থ পুরুষ কটা আছে, রাজারাম। পুরুষ হতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার কোন্‌টা জানো?—একটা শক্ত মেরুদণ্ড। সে মেরুদণ্ড ছিল এককালে। সেটা যেদিন ভেঙে গেল, সেইদিন থেকে লোকের চোখে আদর্শপুরুষ হয়ে উঠলাম আমি। শুনেছ বোধ হয়, ডাকাতি করতাম— দেশের কাজের জন্যে টাকার দরকার ছিল, ওইভাবে টাকার জোগাড় করতে হত। ডাকাতি যদি খারাপ, তবে স্বদেশী ডাকাতকে সম্মান করা কেন? কাঁচা বয়সে এই কদর পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, দেশের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে নাম লিখে রেখে যাব।

ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে। সেইদিকে চোখ রেখে মহাপাত্র বললেন, অমনিভাবে কেউ আছড়ে পড়লেও তাকে উপেক্ষা করতে পারে কে, জানো?

রাজারাম জানে না, মহাপাত্রের মুখের দিকে সে তাকাল, মহাপাত্র বললেন, যার মেরুদণ্ড নেই। তার বাপ ছিল দর্জি, দেশ আরায়, নাম কৌশল্যা। আর বেশি কিছু শুনতে চেয়ো না। এস।

মহাপাত্রের আঙুলের ইশারায় রাজারাম তাঁর সঙ্গেসঙ্গে চলল। শিবমন্দিরের চত্বরে উঠে এল তারা। দু জনে বাঁধের উপর দিয়ে পদ্মার স্রোতের সঙ্গে হেঁটে চলল। অনেকটা পথ যাবার পর বাঁধ থেকে নামলেন মহাপাত্র। রাজারামও নামল। মহাপাত্র তাঁর বাঁ হাত রাজারামের কাঁধের উপর তুলে দিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখালেন, বললেন, এই দেখ।

কিছু নেই সামনে, সমতল বালি-মাখা জমি খানিকটা। রাজারাম বলল, কি ?

—শ্মশান।

আবার ফিরে চললেন তিনি, চলতে চলতে বললেন, দেখলে ?

রাজারাম কিছু বুঝল, আবার কিছুই যেন বুঝল না। সে মহাপাত্রের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধের উপর দিয়ে তিনি এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছেন। পদ্মার বাতাসে তাঁর মাথার চুল উড়ছে, মুখের লম্বা দাড়ি বাতাসের ধাক্কায় তাঁর ডান কাঁধে উঠে এসেছে। হন্ হন্ করে হাঁটছেন মহাপাত্র আগে আগে।

শিবমন্দিরের চত্বরে এসে তিনি বসলেন। রাজারামও তাঁর পাশে বসল। মহাপাত্র বললেন, আটকে গিয়েছি, আর নড়তে পারছি নে। এই গাঁ আমার প্রাণ বটে, কিন্তু তারও একটা হেতু আছে। তলিয়ে কেউ দেখে নি, তাই আমি আদর্শপুরুষ। আদর্শ হতে কাউকে আমি বলি নে, ওটা ডাহা লোকসানের কারবার। ওতে যা ক্ষতি হয়, জীবনে তা আর উশুল হয় না। তার চেয়ে মেরুদণ্ডসমেত একটা আস্ত মানুষ হওয়াই ভালো।

রাজারাম কথা বলছিল না, সে যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। মহাপাত্রের মুখের দিকে চেয়ে সে ভাবছিল নিজের কথা। সে ভাঙা-মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়েছে, না, শক্ত-মেরুদণ্ডের— এইটেই যেন তার নিজের কাছে জিজ্ঞাসা। কিন্তু সে যাই হোক, রাজারাম চায় একটা হদিশ, একটা ঠিকানা। কলকাতা শহর সে দেখেছে একবার একদিনের জন্যে। চাকরি জোগাড় করে শিবলার দিকে রওনা হবার পথে। এর চেয়ে বেশি পরিচয় সে-শহরের সঙ্গে তার নেই। সেই ঘরবাড়ি ও মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা প্রাণীকে খুঁজে বা'র করার শক্তি তার আছে

কি না— এই তার ভাবনা। কিন্তু ভাবনা করতে সে রাজি নয়। খুঁজে বা'র তাকে করতেই হবে। রাজারাম নড়ে বসল।

মহাপাত্র বললেন, অনেকটা পথ। এবার রওনা হতে হয়। ওঠো।

দু জনে উঠে দাঁড়াল। মহাপাত্র বললেন, সটান দেশে যাচ্ছ নিশ্চয়।

—হ্যাঁ। ছয় বছর কারো সঙ্গে দেখা নেই।

—সেই ভালো।

তারা নেমে এল দু জনে। ইটের খোলার গা দিয়ে মাঠ পেরিয়ে পাকা সড়কে এসে দাঁড়াল দু জন। মহাপাত্র বললেন, এখান থেকে ছাডাছাড়ি হই দু জনে—তুমি পশ্চিমে, আমি পূবে।

রাজারাম হাত জুড়ে নমস্কার করতেই মহাপাত্র দু'হাতে তার জোড়-হাত চেপে ধরলেন, বললেন, একটা কথা এখনো বলিনি। লবঙ্গ জানে সব কথা, তোমার মনের কথা। তোমার যা ইচ্ছে তারও তাই ইচ্ছে। কথাটা জানার ইচ্ছে হচ্ছিল নিশ্চয়। আচ্ছা, এসো গিয়ে।

রাজারাম হাঁটতে লাগল শিবলার দিকে, মহাপাত্র তাঁর বাড়ির পথে। দ্রুত পা ফেলে চলেছে রাজারাম, তার হাঁটার তালে তালে কে যেন সুর ধরেছে— পরনে খড়কে-ডুরে, হাতে রুপোর বালা, নাকে নাকছাবি।

এ রকম ভিড় জীবনে দেখেনি রাজারাম। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব মিলে একটা মানুষের স্তূপ তৈরি হয়েছে। দু পাশের দুটো চাকা প্রাণপণ করে জল কেটেও যেন স্টিমারকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না। সবাই নাকি দেশ ছেড়ে চলেছে। কোথায়, কোথায় চলেছে তারা? তা সঠিক তারা নিজেই নাকি জানে না। মানুষের তাড়া খেয়ে মানুষকে এভাবে দল বেঁধে পালাতে হয়, তা রাজারামের কেন, এর আগে নাকি কারোই জানা ছিল না। কেউ ছেড়ে চলেছে নিবিড় আমবাগান,

কেউ সুপারীর বন, কেউ গুটিয়ে নিয়েছে পৈতৃক জাল, কারো সঙ্গে আছে একটা ছোট থলেতে হাতুড়ি বাটালি আর করাত। একটা পুরো দেশ যেন উচ্ছেদ হয়ে নতুন ডাঙার খোঁজে জলে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশের দিকে চলেছে। ভিতরটা আনচান করে উঠল রাজারামের। মহাপাত্রের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর তার বুকের মধ্যে তালে তালে যে-সুরটা বেজে উঠেছিল, তা স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। সে ভাবছে, এমনি একটা ভিড়ের সঙ্গে রামেশ্বররাও কোন্ দেশে চলে গেছে কে জানে! একটা চাপা প্রতিবাদ তার ভিতর থেকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছিল, ঢোক গিলে চুপ করে ভিড়ের চাপে দাঁড়িয়ে রইল রাজারাম।

ভেসে চলেছে জলের গাড়ি। সীমাহীন মহাসমুদ্র সাঁতরে পার হচ্ছে যেন তারা। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। সীমা একটা খুঁজে বা'র করতে হবেই। রাজারাম যেন নির্বোধ হয়ে গেছে, তার মাথার ভিতরটা ওলট-পালট হয়ে গেছে একেবারে। জেলখানায় হরবোলা অনেকবার তাকে বলত এমনি কথা। কিন্তু আসলে পাগল ছিল হরবোলা নিজেই।

সকলে জায়গা খুঁজছে, বসবার নয়, একটু দাঁড়াবার।

চমকে উঠল রাজারাম। মণিলালের গলা যেন। মাঝরাতে এমনি করে সুচেতপুরকে উচ্চকিত করে তুলত সে, লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে গ্রাম টহল দিত আর এমনি করেই চ্যাঁচাত— জাগো হায়, জাগো হায়!

রাজারাম চমকে তাকিয়েই তার ভুল বুঝতে পারল। ফুটন্ত জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে সে চলেছে তার দেশের দিকে। কিন্তু সে কি এখানে? একটানা চলতে থাকলেও তিন দিন লাগবে নির্ঘাৎ।

তিন দিনই প্রায় লাগল। কিন্তু আটকে গেল দিল্লি এসে! যা শুনল এখানে, তা আরো ভীষণ, আরো মর্মান্তিক, আরো ভয়ানক।

পঞ্জাব দু আধখানা হয়ে গেছে, তার দেশ হয়ে গেছে বিদেশ। পঞ্চনদী নাকি রক্তের নদী হয়ে গেছে একেবারে। জেনে-শুনেই কি মহাপাত্র তাকে ঠেলে পাঠাল এখানে? দিল্লির চারধার, দিল্লির পথঘাট লোকের ভিড়ে ঠাসা। দেশ আজাদ হয়ে গেছে তার। তার বাপ কৃপারাম, মা কেশবতী, ভাই শুকদেব আর সহদেব, তার বহিন রুক্মিণী? রাজারাম পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্যাম্পে ক্যাম্পে। তাকে বেরিলির জেলে আটক রেখে তার চোখের আড়ালে এই কাণ্ডটা কেন করল এরা, জানতে ইচ্ছে করে রাজারামের।

ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল রাজারাম, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, ঘর কাঁহা?

হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল একটা বাচ্চা, তার বাপ লাফ দিয়ে উঠে তাকে কুড়িয়ে এনে আবার বসল, বলল, মণ্টগোমারি।

—হাল-চাল?

লোকটা দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলল, পুছিয়ে মাৎ।

সারা গা শিউরে উঠল রাজারামের। যদি কাউকেই সে কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাহলে সে জানবে কি ক'রে, সে খুঁজবে কি করে?

রোদবৃষ্টি মাথায় করে খোলা রাস্তায় আর ফাঁকা মাঠে বসে আছে কাতারে কাতারে মানুষ। সবাই নাকি আসে নি, বহুত লোক নাকি কোরবানি হয়ে গেছে সেখানেই। মেরেছে, কেটেছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে সকলের।

বুকে বল আনবার চেষ্টা করতে লাগল রাজারাম। তার বাপের নিশ্চয় কিছু হয় নি। গাঁওপঞ্চের তার বাপ হচ্ছে মোড়ল, তাকে গাঁ-সুদ্ধ সকলে সমীহই শুধু করে না, ডরও করে। রুক্মিণীকে দেখে এসেছে দশ বছরের, এখন সে কত বড় হয়েছে তাই এখন ভাবছে

রাজারাম। মারামারি কাটাকাটি দেখে রুক্মিণী ভয় পায় নি তো? বহিনের পাঁচটা আঙুল নিয়ে খেলা করত রাজারাম। তার হাতটা বিছিয়ে ধরে বলত, এই আমাদের পঞ্জাব, আর এই হচ্ছে পাঁচ নদী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা—! আর সে ভাবল না। ফুটপাথ থেকে উঠে রাস্তা পার হয়ে ওপারের ভিড়ের সঙ্গে সে মিশে গেল। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে সুচেতপুরের কারও সঙ্গেই কি দেখা হবে না?

গাড়িঘোড়া টাঙ্গা সাইকেল তীব্রবেগে এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে রাজধানীতে। এই জন-অরণ্যের মধ্যে সে কে, আর কতটুকু? তার কথা ভাববে এমন লোক সে খুঁজে পাবে কোথায়। জনহীন মহাদেবপুর দেখে এসে জনতায় পরিপূর্ণ এই নগরীর পথঘাট দেখে তার আশ্চর্যই লাগছে। চারদিকে হল্লা আর কোলাহল। এর মধ্যে তার গলার স্বর কারো কানে গিয়ে পৌঁছবে, এমন আশা সে করে কী করে? কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে সে রাজি না। তার কেবলই মনে হচ্ছে, ধীর স্থির হয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে খুঁজলে এই ভিড়ের মধ্যে থেকেও সে খুঁজে পাবে তাদের।

তার বাড়ির এত কাছে এসেও সে আর-একটু এগিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারছে না, এটা কম আক্ষেপের কথা নয়। তাদের সেই খাপরার চালা, বাড়ি থেকে দু কদম এগিয়েই সেই নহর— মরা স্রোত হলে হবে কি, সেই জলে তারা কত দাপাদাপিই-না করেছে। রুক্মিণী সাঁতার শিখেছে ওই জলে। একদিন হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল প্রায়, সহদেবের চোখে না পড়লে সেদিন কী যে ঘটত ঠিক নেই। মনে পড়ে, গোষ্ঠ-উৎসবের সেই মেলা। তরাগ, ইলাহী, কাউনিয়া, ফরিদা— এইসব গ্রাম থেকে পালে পালে আসত কত রকমের গোরু ফরবেশগঞ্জে। আর তাদের সেই বাথান। তার মা, তার বুড়ো বাপ! রাজারাম হঠাৎ রাস্তা পার হতে গিয়েই মাঝপথে থেমে গেল, একটুর জন্যে চাপা

পড়ে নি। শব্দ করে ব্রেক কষে তার গায়ের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল মোটরগাড়ি।

ওপারে গিয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ক্যাম্পে ক্যাম্পে সে যে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু খুঁজবে কোথায়? পথের দু'পাশেই তো হাজার হাজার ক্ষুদে ক্যাম্প। কম্বল কাপড় পাগড়ি— যে যা পেয়েছি তাই দিয়ে একটু একটু জায়গা ঘিরে নিয়েছে। সেইখানে তারা সব ঘর-কন্না পেতে বসেছে।

তেমাথা থেকে হল্লার আওয়াজ পেয়ে রাজারাম জোর কদমে সেদিকে গেল। সরাইখানা। ইঁটের উপর কাঠের তক্তা ফেলে বেঞ্চি বানানো হয়েছে, উপরে তাঁবু খাটানো। ছেঁড়াছুটো ময়লা ঢিলে নানারকমের পোশাকপরা নানা রকমের লোক বসে বসে চাপাটি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। যত-না খাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি হাহাকার করছে তারা। সরাইখানার পাশে দাঁড়াল সে কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে সে তাঁবুর নীচে গেল। বেঞ্চির একটা কোণে বসতে গিয়েই নড়ে উঠল সবসুদ্ধ। নীচের ইঁট হয়তো আলগা ছিল। সকলে একসঙ্গে বিরক্ত হয়ে খিঁচিয়ে উঠতেই রাজারাম অন্য একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। সে খেতে আসে নি, সে এসেছে শুনতে।

রাজারাম যা জানতে চায় সে কথা কেউ বলছে না। সকলেই বলছে নিজের নিজের কথা। কে কোনো রকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে, কার যথাসর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কার চোখের সামনে তার মেয়েকে টেনে নিয়ে গেছে, বাপকে কেটে দু খানা করেছে। সকলের চোখে প্রতিহিংসা নেবার উগ্রতা।

রাজারাম কারো সঙ্গে কথা বলছে না। একা একা সে বসে আছে। তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে দূর থেকে একজন একদৃষ্টে তার দিকে

চেয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে। লোকটা রাজারামকে লক্ষ্য করছে, হাঁ করে এত কথা গিলছে কেন ও।

লোকটা উঠে এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ইউ। চাই কি ?

রাজারাম জানাল সে কিছু চায় না।

—দেশ কাঁহা।

—পঞ্জাব। সুচেতপুর।

—নাম ?

নিতান্ত অনুগতের মতই সে জবাব দিল, রাজারাম আহির।

লোকটা বোধ'য় আশ্বস্ত হল, কিন্তু তবুও সে রাজারামের মুখের দিকে চাইতে লাগল। তার চেহারাটা যেন পছন্দ হয় নি লোকটার। মাথায় চুল নেই, গলায় কালচে দাগ।

লোকটা চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরল, বলল, কাঁহা সে আ রহা।

—বেরিলি।

লোকটা বলল, এখানে কেন তবে ?

কৈফিয়ত দিত রাজারাম। কিন্তু অযথা এই জেরা শুনে সে উঠে দাঁড়াল, সে জানাল সে তার বাপ-মা ভাই-বহিনকে খুঁজছে। কথাটা বলতে গিয়ে রাজারামের মত খুনীর চোখ ভিজে উঠল।

লোকটা সেদিকে না তাকিয়ে জানাল— এটা সুচেতপুর ক্যাম্প নয়, এটা লায়ালপুর ক্যাম্প। সুচেতপুর কোন্ দিকে গেলে পাবে তা সে বলতে পারে না।

এ কথা শুনে রাজারাম যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল। তবে খুঁজে পাওয়ার পথ যেন আছে। লায়ালপুর সে পেয়েছে, সুচেতপুর তবে পাবেই।

একটু আগে যাদের খুঁজে পাবার আশা সে করতে পারে নি, তার এখন মনে হতে লাগল— তাদের সে যেন খুঁজে পেয়ে গেছে প্রায়।

তাকে পেয়ে তার বাপ তাকে কি ভাবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, কেশবতী হয়তো আনন্দে কেঁদেই উঠবে, শুকদেব সহদেব কি করবে তা সে ভাবল না, সে ভাবল রুক্মিণীর কথা। এখন সে বড় হয়েছে, চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে সে তো আর খুশি জানাবে না এখন, ঠিক কী ভাবে সে তার দাদার কাছে এসে দাঁড়াবে সেইটে ভাবার চেষ্টা করতে লাগল রাজারাম। কিন্তু তার হাতে দাগ, গলার দাগ— হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল রাজারাম, এই দাগ দেখে কি ভাববে তারা? সে যে খুনী —এ কথাটা সে বলবে কি করে? ছয়টা বছর সে একেবারে চুপ করে কাটিয়ে দিয়েছে। বাপের উপর অনেকটা রাগ করেই সে ঘর ছেড়েছে। আসার সময় বুক ফুলিয়ে বলেছিল, নতুন মানুষ হয়ে সে ফিরবে, তার আগে কিছুতেই ফিরবে না, কোনো খবরও সে দেবে না। ঠিকাদার কোম্পানির কাজে যতদিন বহাল ছিল ততদিন টাকা সে পাঠিয়েছিল অবশ্য। তার পর চলে গেল জেলে, একেবারে বোবা হয়ে গেল যেন সে। সে নিজের খবর দিলও না, কোনো খবর নিলও না। তার বাপ-মা হয়তো খাপরার ঘরে বসে বসে ভেবেছে, তাদের চোখের আড়ালে চুপে চুপে মানুষ হয়ে উঠছে তাদের ছেলেটা। কিন্তু ঠিক সেই সময় হরবোলার সঙ্গে সে ছেলে কোনো গতিকে দিন কাটাচ্ছে। এইভাবে দশ বছর কাটাবার জন্যেই সে তৈরি ছিল, তৈরি না থেকে উপায় ছিল না বলেই হয়তো সে নিজের মনের সঙ্গে আপোস করে নিয়েছিল এইভাবে। কিন্তু হঠাৎ দেশ আজাদ হয়ে গেল, আর-পাঁচজন কয়েদির সঙ্গে সেও বখশিশ পেয়ে গেল, আদ্দেক মেয়াদ মাপ হয়ে গেল তার। আগাম খালাস যখন পেয়েই গেল, আগাম দেখাই-বা হবে না কেন তার ভাই-বহিনের সঙ্গে। কতটা মানুষ সে হতে পেরেছে, হাতের আর গলার দাগ দেখে আন্দাজ করে নেয় যদি তারা? করুক। আর কোনো লাজ নেই তার। সে এখন

তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যেই ব্যাকুল হয়েছে। এতদিনে দাগ তো মুছেই এসেছে অনেকটা, আর দুচার দিনে হয়তো আরও আবছা হয়ে যাবে। পাঁচ বছরের জমানো জঞ্জাল এক নিমেষে সাফ করে ফেলার আশা সে করে না।

হঠাৎ খেয়াল হল রাজারামের— এতক্ষণ এক পাও সে এগোয়নি, একইভাবে একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। লায়ালপুর সরাইখানা থেকে বিকট কান্নার স্বর ভেসে এল তার কানে। কিন্তু লায়ালপুরের উপর তার কোনো টানে নেই, সে চায় সুচেতপুর। রাজারাম এগিয়ে যেতে লাগল। ফুটপাথের কিনারে ছোট একটা সংসার আগুন জ্বেলে রুটি তাওয়াচ্ছে।

রাজধানী চষে বেড়াল রাজারাম, কিন্তু সুচেতপুর ক্যাম্প পেল না। এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর সার সার শুধু শিবির— ছোট বড় মাঝারি; মাঠ আর প্রান্তর ভরতি। মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা জলার চারপাশ ঘিরে একপাল সারস যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে।

চার দিন ধ'রে সে ওই তাঁবুগুলোর প্রত্যেকটিতে খোঁজ করেছে, একটা চেনা লোক কি একটা চেনার মুখের সঙ্গে দেখা হল না তার। সকলের চোখমুখ কি বদলে গেল তবে? একজনকেও সে চিনতে পারছে না কেন? সে নাহয় বদলেছে, তাকে নাহয় চিনতে পারা শক্ত।

—চিনতে পার? একজন অচেনা লোক হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে রাজারামের হাত চেপে ধরল।

রাজারাম চমকে তাকাল তার মুখের দিকে, কোনো দিন একে সে দেখে নি। মুখ-ভরতি কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখের উপর ঝুলে পড়েছে মাথার চুল, পরনে ডোরাকাটা ছেঁড়া পায়জামা।

রাজারাম মাথা নাড়ল, সে চেনে না।

—তুমি রাজা ?

রাজারাম মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ।

লোকটা তার চোখের সামনে আর-একটু সরে এসে বলল, আমি মণিলাল।

মণিলাল ? চৌকিদার ? দাড়িগোঁফের ওই পর্দার আড়ালে চেনা মুখটা হঠাৎ চিনতে পারল রাজারাম। দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। হাত ছেড়ে বলল, সমাচার। সমাচার কি মণিভাই ?

—জান না কিছু ?

—না। দুচোখ বড় করে তাকাল রাজারাম।

—সব খতম। মণিলাল বিকট শব্দে হেসে উঠল, বলল, খতম। সাফ। দুচোখে দেখেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—না। অস্পষ্ট শব্দে বলল, রাজারাম।

—আমারও না। মণিলাল আবার তেমনি করে হেসে উঠল।

তার শক্ত আর মজবুত পা দু'টো কাঁপে কেন এমন করে ? দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে মণিলালের হাত চেপে ধ'রে রাজারাম একে একে সকলের নাম করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। মণিলাল নির্বিকার ভাবে জবাবও দিতে লাগল প্রত্যেকটি কথার।

—বাপুজি ?

—খতম।

—মাতাজি ?

—খতম।

—শুকদেব, সহদেব ?

—খতম।

—রুক্মা, রুক্মিণী ?

—সাফ।

উবু হয়ে বসে পড়ল রাজারাম। তার দু চোখ শুক্‌নো খটখট করছে। মাথাটা একেবারে হাল্কা—ফাঁকা। তার এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছে এইখানে এখনি মণিলালকে পিষে মেরে শেষ করে ফেলে। এই খবরটা তাকে দেবার জন্যেই বুঝি নিজের প্রাণটা নিয়ে ও পালিয়ে এসেছে। ভীরু, কাপুরুষ মণিলাল। গাঁয়ের চৌকিদার, গাঁ পাহারা দিতে না পেরে গাঁ ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

রাজারাম হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মণিলালকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল হঠাৎ। সে কান্না যখন থামল তখন রাজধানীর বুকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

একটা দিক তাকে এভাবে বিলকুল ছুটি দিয়ে দেবে তা তো সে ভাবে নি। হাতের আর পায়ের বেড়ি যেদিন তার খুলে গেল সেদিন সে নিজেকে ভেবেছিল, সে সত্যি যেন রাজা। আজ আবার নতুন করে সেই বোধটা সে অনুভব করল। সেদিন হঠাৎ লায়ালপুর সরাই-খানায় আচম্‌কা অমন কান্নার রোল উঠে আবার তখনই চট করে তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন, আজ সে বুঝতে পারছে। এমনি একটা মণিলাল বোধ হয় এমনি একটা খবর এনে এমনি একটা রাজারামের কানে তখন পৌছে দিয়েছিল।

মণিলাল বলল, আয়।

কিছু জিজ্ঞাসা না করে রাজারাম তার পিছন পিছন চলল। তার মনে হতে লাগল, মণিলাল মিথ্যে কথা বলেছে, সব না জেনে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে নিশ্চয়।

—এই আমার ডেরা। মণিলাল দাঁড়াল।

মাঠের মাঝখানে কয়েকটা কাঠের পিল্‌পে পোঁতা, তার সঙ্গে টেনে-

টেনে বাঁধা কয়েকটা কম্বল। মণিলাল মাথা নীচু করে ঢুকে পড়ল। রাজারাম তার সঙ্গে ঢুকল।

অন্ধকারে কাৎরায়-কে? আশেপাশে কোথাও আলো নেই। দূরে ক্যান্টনমেণ্টের এরিয়ালের মাথায় একটা জোরালো আলো জ্বলছে। রাজারাম কম্বল একটু ফাঁক করল। এই গাঢ় অন্ধকারে ওই আলোই মনে হল অনেক। অন্ধকারে যা দেখা যাচ্ছিল না, এই আলোতে তা আবছা ছায়ার মত দেখাল। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না, চেনা গেল না।

মণিলালের গায়ে ধাক্কা দিয়ে রাজারাম জিজ্ঞাসা করল, কে?

—চিনিস্ না? তোর বাপুজি। এই বুড়াকে টেনে এনেছি।

রাজারাম বিশ্বাস করল না, কম্বল ছেড়ে দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সে কাছে গেল, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে খুঁজল কোথায় মাথা, কোথায় মুখ, কোথায় বুক। ঠিকই তো, গালের উপর এই তো সেই বড় আঁচিলটা, বাঁ হাতের কনুয়ের কাছে এই তো সেই কাটা দাগের গর্তটা।

কানের কাছে মুখ নিয়ে রাজারাম ডাকতে লাগল বাপুজিকে। কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। ঘুমিয়ে আছে হয়তো।

মণিলাল বলল, শক্ত হাড্ডি, তাই জিন্দা আছে এখনো। ওই বুড়াও দেখেছে সব। ডাকুরা কেটেছে ওর সাম্‌নে সকলকে, আর রুক্মাকে টেনে নিয়ে হাওয়া।

তারা নাকি পৌঁছেছে পরশু। লাখ লাখ লোক নাকি আসছে পায়ে হেঁটে দলে দলে। তারা ভালো আস্তানা পায় নি এখনো। বুড়াকে নিয়ে শিগগিরই মণিলাল একটা তাঁবুতে গিয়ে ঢুকবে।

কান পেতে শুনল রাজারাম। রুক্মা তবে খতম নয়, রুক্মা সাফ! হোক। আর পরোয়া নেই তার। সে এখন চায় একটা আলো। সে তার বাপের মুখটা দেখতে চায় একটু।

মণিলাল বলল, মাচিস নিয়ে আসি।

দেশলাইয়ের খোঁজে মণিলাল চলে গেলে রাজারাম তার বাপের গলা বুক আর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ডাকতে লাগল শুধু। কিন্তু রূপারাম একটা কথারও জবাব দিল না। একটু কাৎরাচ্ছেও না কেন? কম্বলে ঢাকা এই অন্ধকারের মধ্যে তাহলেও একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ বাদে মণিলাল এল, হাতে হারিকেন। ঠিক যেন সেই চৌকিদার মণিলাল। আলো নিয়ে সে ঢুকতেই রাজারাম দেখল চিৎ হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে তার বাপ। এই কয় বছরে মুখ-চোখ একটুও বদলায় নি— কেবল মুখের উপর একটা আলগা কালো ছাপ পড়েছে। সেই ছাপ হারিকেনের আলোর নীচে ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। হাত-পা হিম হতে লাগল সেইসঙ্গে।

এর পর কয়েকদিন রাজারাম রাজধানীতে ছিল। মণিলাল যতই তাকে ঘিরে থাকতে চায়, ততই সে মণিলালকে এড়িয়ে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করে। দলে দলে এই-যে এত লোক রোজ আসছে, এদের সঙ্গে হঠাৎ একদিনও এসে পড়ে না কেন রুক্মা। না পড়ুক, আর সে পরোয়া করে না কারু জন্যে।

মণিলালের চোখে ধুলো দিয়ে একদিন হঠাৎ সে যে কোথায় হারিয়ে গেল, সারা শহর টহল দিয়েও আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

মহাদেবপুরের স্মৃতি হয়তো ইতিমধ্যে ম্লান হয়ে গেছে, মুছে গেছে মহাপাত্র। রাজারাম কোথায় আছে সে সংবাদ আমাদের পাওয়াও

এখন কঠিন। যার জীবনে একদিন চকিত বসন্ত এসেছিল, তার ফাল্গুন ফুরিয়ে গেছে কি না, তা অনুমান করে বলা সহজ নয়। হোঁচটে হোঁচটে সে হয়রান হয়ে গেছে কি না, তাই-বা বলা যায় কী করে। পদ্মাও একদিন প্লাবনের আবেগে ফুলে-ফেঁপে উঠে দুকূল ছাপিয়ে ছুটবার নির্বাধ আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে, আবার সে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে; পাঁচ নদীতেও আসে পঞ্চ বান, সে বানও চিরস্থায়ী নয়। মানুষের মনও যদি হঠাৎ অস্ফুট হাহাকারে আর্তনাদ করে ওঠে একদিন, সে হাহাকারও একদিন তেমনি থেমে যায়; একদিন যদি সে দুর্বার আগ্রহে আকুল হয়ে ওঠে, পরদিন তাকে নিরাসক্ত দেখলে তাই চমকাবার কথা নয়।

এক দুই তিন ক'রে আট-দশ মাস কেটে গেল, তবু আমাদের সামনে এসে সে যে দাঁড়াল না, এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যুদ্ধ থেমে গেছে অনেকদিন হল, কিন্তু তার চিহ্ন আজও মুছে যায় নি একেবারে। যা ছিল সেপাইদের থাকবার আস্তানা, তাই এখন হয়েছে উদ্বাস্তুদের ডেরা। উচ্চ মাঝারি ও নিম্ন— মধ্যবিত্তদের ভাগ করা হয়েছে এই তিন ভাগে। রামেশ্বররা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েছে এখানে। কলকাতার উপকণ্ঠে অভিজাত পল্লীতে বাস করে তারা। বোম্পাস হ্রদের পশ্চিম কিনার ঘেঁষে লম্বা সার সার কাঠের বাড়ি— সবুজ রং করা, উপরে টালি। ফাটা টালি পিচ ঢেলে জোড়া লাগানো হয়েছে। ডেরা পেয়েছে, এই যেন ঢের। সরকারী সাহায্য এখনো পাচ্ছে, কবে বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক নেই। অনিশ্চিত জীবন কাটছে দিনের পর দিন। বছর ঘুরে এল।

—হাতের কাজ না জানলে এ-বাজারে কদর নেই যে। লৌহজঙের হরিপদ গড়িয়াহাটের বাজারে তক্তা ফেঁড়ে রোজ এক টাকা কামাচ্ছে। তার সম্বল তো একটা বাটালি আর আধখানা করাত।

রামেশ্বর জানার মধ্যে জানে লাঙল চালাতে। এখানে সে-কাজ সে পায় কোথায়। এ-কাজে অতটুকু সম্বল নিয়ে চলাও তো যায় না। জমি চাই, লাঙল চাই, বলদ চাই। কিন্তু সবার আগে চাই টাকা।

প্রথম প্রথম এসে এরা চারদিকে তাকাত আর অবাক হত— বড বড় দোতলা হাওয়াগাড়ি হুটপাট করে ছুটছে। এখন দেখে দেখে সয়ে গেছে চোখে। মাঝখানে ঘাসের জমি, লম্বা একটা ফালির মত সোজা চলে গেছে কোথায়, তার এপাশে আর ওপাশে দুটো কালো চকচকে রাস্তা। রাস্তা পার হতে ভয় করত আগে, কিন্তু সে-ভয় এখন ভেঙেছে। এখন এপার-ওপার হয়ে যায় ওরা সহজে।

এক-একটা লম্বা কাঠের বাড়ি যেন এক-একটা পল্লী। তিরিশ-চল্লিশ ঘর লোক এই রকম এক-এক পাড়ার বাসিন্দে। মাদারিপুর, টাঙাইল, লৌহজঙ, ফেণী, বাখরগঞ্জ—সব জায়গার লোক এসে জড়ো হয়েছে বোম্‌পাস হ্রদের কিনারে। হ্রদের জলে ছায়া পড়ে তাদের—টলটলে নিটোল জল, পদ্মা-মেঘনার মত ঘোলাটে নয়। আশপাশের মানুষগুলোও অমনি পালিশ-করা, মাজাঘষা। এদিক ওদিকের মস্ত মস্ত বাড়ি থেকে লোকজন তাদের দেখে— এই নতুন প্রতিবেশীদের। নতুন প্রতিবেশীরাও তাদের দিকে মাথা উঁচু করে কখনো একটু-আধটু তাকায়। মাটির সঙ্গে আকাশের সম্পর্ক যতটা নিবিড়— এদেরও ততটাই, তার বেশি নয়।

উচ্চ মাঝারি ও নিম্ন— এই তিন শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয়টা যে রামেশ্বররা পেয়েছে এতে তারা কৃতজ্ঞ। তাদের মুখ-চোখ দেখলে সহজেই তা বোঝা যায়। এখানে এসে বছর-খানেকের মধ্যে ধাঁ ধাঁ করে অনেকটা লম্বা হয়ে গিয়েছে মানিক। লম্বা হলে ভয় পাবার কথা নয়, রামেশ্বর আর সুখদা এতে ভয়ও পায় না। কিন্তু তাদের ভয় পাওয়ার কারণ

অন্য। লবঙ্গর গড়নই একটু বাড়ন্ত, এর মধ্যে সে আরো ভারি-সারি হয়ে উঠেছে, এলাচের বাড়টা থমকে থেমে আছে আপাততো।

এক নম্বর ক্যাম্প থেকে মাদারিপুরের পিসিমা রোজ বেড়াতে আসেন এ পাড়ায়— এই তিন নম্বরে। তিনি ক্যাম্পের গেজেট। কোথায় কি হল, কতটা রেশন জনপ্রতি বরাদ্দ হওয়া উচিত, এই মিনিস্ট্রি টিকবে কি না—সব তাঁর নখদর্পণে। বলেন, তোমাদের গবর্নমেণ্ট কাল তো আমার ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মনোরঞ্জন দিয়ে এসেছে লম্বা লম্বা কথা শুনিয়ে। বলেছে, রেশন দিচ্ছ, কাপড় দিচ্ছ, থাকবার জন্যে ফুটো-চালের ঘর দিয়েছ; কিন্তু যারা সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে নিয়ে পদ্মাপাড়ি দিয়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে এসেছে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেবার করছ কি?

তিন নম্বর ক্যাম্পে সোমত্ত মেয়ের অভাব নেই। হারান চাকী, হরেন সরকার, বিলাস বসু, দ্বিজু মোড়ল— সবার মেয়েই বড়-সড়, তার মধ্যে রামেশ্বরেরটা সবায়ে বেশি। মাদারিপুরের পিসিমার কথা তাই বেশি কান করে শোনে সুখদা। সুখদা জিজ্ঞাসা করে, জবাবে ওরা বলে কি?

মাদারিপুরের পিসিমা বলেন, বিয়ে কি এককথায় হয়ে যায়। হাজার কথা না হলে বিয়ে কী? কথা পেড়ে এসেছে সে, যদি দেখা যায় গড়িমসি করছে তখন আন্দোলন করতে হবে। পয়লা নম্বর কথা— পাত্তর, পাত্তর মানে পাত্তরের চাকরি, নগদ টাকা, গয়নাগাটি। এটা তো নিজের দেশ নয়, গাঁ-সুদ্ধ লোক ডাকতে চায় কে? তবে, আমাদেরই মধ্যের পাঁচজন এপাড়া ওপাড়া থেকে এসে একসঙ্গে বসবে, না না করেও তাতে কিছু খরচ আছে।

যার যা চাহিদা, যার যেটুকু পেলে ভালো হয়— পিসিমা এসে তাকে

তা-ই পাইয়ে দেবার আশা দেন। এতে তাঁর যেমন কদর বাড়ে, তাঁর ছেলে মনোরঞ্জনের ক্ষমতার কথা প্রচার হয় সেই অনুপাতে। যে পাড়ার যে অঙিনায় গিয়ে তিনি হাজির হন, সেখানেই তাই তাঁর জন্যে আসন পাতা হয়— পাড়ের সুতো দিয়ে বরফি-কাটা চটের আসন। পরনে যদি থাকে পাটের কাপড়, তখন বুঝে নিতে হয় পিসিমা বসতে আসেন নি, আহ্নিক করতে বসার আগে এসেছেন শুধু একবার খবর নিতে। বোম্‌পাস হ্রসের বারোয়ারি পিসিমার খ্যাতি কেবল এখানকার এই তিনটে ক্যাম্পেই আটক নেই, তাঁর খ্যাতি পৌঁছেছে বেলঘরিয়া বেলগাছিয়া ক্যাম্প পর্যন্ত।

পিসিমা বলেন, পাঁচজন শৌখিন লোক বলে বেড়াচ্ছেন— খেটে খাও, কাজ কর। আমরা উদ্বাস্তু, বাস্তুহারা— আমরা খাটব কেন, কাজ করব কেন। কাজই যদি করব, তখন আমাদের নিজেদের ভিটে দোষ করেছিল কি, সেখান থেকে আমাদের টেনে আনা হল কেন।

হারান চাকীর বৌ বলল, খাটতে তো উনি রাজি। কিন্তু কি কাজ—

বাধা দিয়ে পিসিমা বললেন, খবরদার, সাবধান। ওকথা চেঁচিয়ে বলেছ কি মরেছ। নতুন দেশে এসেছ, এখানকার হাল-চাল আগে বুঝে নাও, তার পর প্রাণ খুলে কথা বলো। হারানকে বলে দিয়ো, আমি বলেছি।

হারান চাকীর বৌ আসন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, পেতে দিই, বসেন।

—না, আমি আর বসব না। পূজো-আহ্নিকই সারা হল না এখনো। সব কাজ পড়ে আছে।

পিসিমা দুপা এগিয়ে এসে রামেশ্বরের দরজায় দাঁড়ালেন, বললেন, কি বৌ, ঘরের মধ্যে হচ্ছে কি।

—বড়মেয়ের চোখ উঠেছে। হলুদে গ্ঢাকড়া ছুপে দিচ্ছি।

হাহা করে উঠলেন পিসিমা, বললেন, ককৃখনো না। শ্বেতচন্দন ঘষে চোখের উপর-পাতায় আর নীচের পাতায় লাগিল দাও। একবার চোখ উঠেছিল আমার সেজছেলে জনার্দনের— পিসিমা দরজার বাইরে আলগোছে উঁচু হয়ে বসলেন, বললেন, সে কী যন্ত্রণা—

সুখদা একটা আসন নিয়ে এসে বলল, বসেন।

—না বসব না। দেখছ না, পাটের কাপড় পরনে। এক্ষুনি যাব।

কিন্তু পিসিমা গেলেন না। চোখ উঠার নানারকম ওষুধ সম্বন্ধে অনেক রকম পরামর্শ দিতে আধ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল।

পয়লা নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা পিসিমা। কিন্তু তিনি বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে নাকি পারেন না। যতটুকু সময় তিনি নিজেদের আস্তানায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকেন, সে সময়টা তাঁর প্রাণ নাকি পুড়তে থাকে এদেরই জন্যে। এদের অভাবের কথা, দুঃখের কথা, কষ্টের কথা কিছুই তো তাঁর অজানা নয়। মাদারিপুরের কিছু জমি-জমা বিক্রি করা গেছে, কিছু গয়না আছে সঙ্গে— তাই ভাঙিয়ে কোনোগতিকে দিন তাঁদের চলেছে, সরকার থেকে রেশন দিচ্ছে তাই তবু বাঁচোয়া। তা না হলে চোখে সরষের ফুল দেখতে হত। ভাইঝি-ভাইপোদের যত বায়না সব এই পিসিমার কাছে। তাদের শখটা-আশটা তো তারা আর নিজেদের ভিটের সঙ্গে ফেলে আসে নি। সেসব মেটাতে হয় এই পিসিমাকেই। কিন্তু যাদের কিছু-বলতে-কিছু নেই, তাদের দুঃখের কি অন্ত আছে, সুখদা।

কথাগুলো একেবারে আঁতে গিয়ে লাগল সুখদার। একবার মেয়ে-দুটোর দিকে তাকিয়ে সুখদা বলল, বাবুয়ানি কোনোদিনই ওদের নেই। কিন্তু লজ্জা ঢাকবার জন্যে যেটুকু দরকার, তাও তো সব দিতে

পারি নে। এমন বেঘোরে পড়তে হবে, তা কি আর আগে ভাবতে পারা গিয়েছিল, পিসিমা।

হলদে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে লবঙ্গ চোখ মুছছে। জবাফুলের মত লাল টুকটুক করছে তার দুচোখ। কিন্তু ওই রুগ্‌ণ চোখেই দেখা যায় সব। জানলার ওপারেই তাদের বেড়া, বেড়ার ওপারে পিচ-ঢালা রাস্তা। তাদের গাঁয়ের নতুন সড়ক দেখেই চোখ তাদের ঝলসে গিয়েছিল, কিন্তু এই রাস্তায় যখন দুপুরের রোদ এসে পড়ে তখন সত্যিসত্যি আলো ঠিকরে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। লবঙ্গর মনে পড়ে যায় একটা লোকের কথা। হলদে ন্যাকড়া দিয়ে চোখের কোণ আবার মুছে নিতে হয় তাকে। তারা তো ছিটকে চলে এসেছে এত দূর, সেই লোকটা আজো হয়তো ফাটক খাটছে— অযথা হয়রান করা হচ্ছে ওকে। সেই বজ্জাতটা নিজে তো মরলই, অকারণে তবু আর-একজনকে সাজা দিতে ছাড়ল না।

পিসিমা চলে গেলেন, কিন্তু সুখদার মনকে জখম করে দিয়ে গেলেন। একেই মনটা পাঁচ-সাত রকমের হয়ে আছে, তার উপর একটু ওস্কানি পেলে আরও যেন দুমড়ে যায়। আড়-চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকাল সুখদা। বয়স তো অনেক হয়েছে, আর ধরে রাখা যায় না।

—ধরে রাখতে না ইচ্ছে করে, ছেড়ে দাও। বিয়ে বিয়ে বিয়ে। ইচ্ছে করে তুমি আবার বিয়েয় ব'সো গিয়ে। দুটো লাল চোখ কুঁচকে লবঙ্গ তেতে ওঠে।

সুখদা নিশ্বাস ফেলে। হয়তো ভাবে, মেয়ের মন থেকে ও-বিষ এখনো নামে নি। লঙ্গরখানায় হঠাৎ কি ভাবে যে সে তুক হয়ে গেল।

রামেশ্বর হয়তো কোনো প্যাঁচ কষছে, হারান বিলাস আর দ্বিজুর সঙ্গে কয়েকদিন ধ'রে ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে ফিসির-ফিসির চলছে

তার। সুখদা মস্ত কিছু আশা করেছিল, পরে শুনল ব্যাবসার ফন্দী বার করেছে একটা। চানাচুর আর বাদামভাজার ব্যাবসা। এটা যদি একটু লেগে যায় তা হলে নকুলদানা আর ঘুঘনিও ধরবে।

বোম্‌পাস হ্রদের কিনার ঘিরে রোজ বিকেলে মানুষের মিছিল শুরু হয়। জলের ধারে বেঞ্চে বসে জ'লো হাওয়া পান করে কেউ, কেউ-বা চক্কর দিয়ে বেড়ায় রাস্তা বরাবর। মানুষের এই মেলায়, রামেশ্বর আন্দাজ করে নিয়েছে, তাদের বেসাতি জমবে ভালো।

—চাই চানাচুর কুড়মুড়-ভাজা। কাঁধে থলে ঝুলিয়ে একদিন সত্যিই মানিক এসে হাজির হয় এই অচেনা মানুষের মধ্যে।

লবঙ্গ তার কানে-কানে বলে দেয়, দেখিস্ তো কা'রো দেখা পাস্ কি না।

—কার?

—তোর রাজাদার।

চমকে তাকায় মানিক, বলে, সে-না জেলে।

—কতজন ছাড়ান্ পেয়ে গেছে। সেও তো পেতে পারে।

মানিকের সঙ্গে এটা তার গোপন আলাপ। সুতরাং এ কথা নিয়ে মানিক যেন কোনো গল্প না করে, সাবধান করে দিল লবঙ্গ।

ঝামেলায় আর ঝঞ্ঝাটে, টানায় আর পোড়েনে যাদের দিন চলে, তাদের ছেলেপিলের জ্ঞান নাকি হয় টনটনে। তারা নাকি ফাৎরা আর ফাজিল হয় না, অকালেই নাকি পাকতে হয় তাদের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মানিককে পক্ক বলতে হবে।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিন নম্বরে চানাচুর-তৈরির হিড়িক চলতে থাকে। যেন একটা কারখানা। চার জন অংশীদার এর। অংশীদারদের বৌ ছেলে আর মেয়েরা এই ক্যাম্প-কোম্পানির মজুর।

মাদারিপুরের পিসিমা এসে বলেন, নিজে হাতে অমন করে নিজেদের কবর খুঁড়ো না, পই-পই করে বারণ করছি। দাসীর কথা বাসী হলে কাজে লাগবে, দেখো।

কিন্তু কারখানার কাজ তবু থামে না। যারা চিরকাল খেটে খেয়ে এসেছে, তারা কাজ না পেলে সোয়াস্তি পায় না। মহাদেবপুরে যে-সময়টা হলুদ কুটে, চাল-ডাল ঝেড়ে, ডালের বড়ি দিয়ে সময় কাটত, সেই সময় এখন সুখদা বাদাম ভেজে, তেল-কাগজের প্যাকেট তৈরি করে কাটাতে ভালোই বাসছে।

সেদিন এসে বারোয়ারি পিসিমা জানিয়ে গেলেন, মনোরঞ্জন নাকি তেতে আগুন হয়েছে, বলে দিয়েছে, সে কারো জন্যে আর-কিছু করতে পারবে না। এইসব লোভীদের ঝঞ্ঝাট আর পোয়াবে না সে। সে নাকি সাফ বলে দিয়েছে, এসব আহাম্মকদের নিয়ে আন্দোলন করা অসম্ভব।

পিসিমা চলে যান, যাবার সময় ভাইপো-ভাইঝিদের জন্যে দু প্যাকেট চানাচুরের নমুনা নিয়ে যান হাতে ক'রে।

এক নম্বর ক্যাম্পে হারমোনিয়াম প্যাঁ-পোঁ করে বেজে ওঠে মাঝে-মাঝে। গান গায় নাকি হীরা।

দুপুর বেলা চারদিক যখন চুপচাপ নিঃঝুম, বোম্‌পাস হ্রদের জলের ধারে ব'সে যখন এক-ঠেঙে বক তন্দ্রায় ঝিমতে থাকে, তখন গান গায় হীরা। কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপর ছোট্ট আয়নাটা রেখে মুখে পাউডার মাখে, চুল আঁচড়ায়, ফুল-হাতা জামা গায়ে দিয়ে এদিক-ওদিক একটু চায়, আর গান করে গুনগুন করে। তার মনটা উদাস হয়ে যায় এই সময়। তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সে হারমোনিয়াম টেনে বার করে।

পিসিমা বলেন, একবার গলা ছেড়ে গা দেখি, হীরা। কদ্দিন তোর গান শুনি নি।

হীরা গায়। এক নম্বর ক্যাম্প হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাত-কাটা গেঞ্জি-গায়ে খাকি ট্রাউজার-পরা চার-পাঁচটি ছেলে ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিস দেয় আর তুড়ি দিয়ে তাল দেয়।

হীরার পিসির যেমন নাম-ডাক, হীরার নাম-ডাকও প্রায় তেমনি। তার এই গান দিয়ে সে বুঝি শুধু তার পিসিমার নয়, আর পাঁচজনেরও প্রাণ মাতিয়ে দিয়েছে।

ক্যাম্পের মাঝখান দিয়ে ইঁট-বাঁধানো সিমেণ্ট-করা পাঁচহাত চওড়া রাস্তা সটান এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে এদিকের ঘর থেকে ওদিকের ঘরে যাতায়াত করতে হয়। দুপুর বাজলেই চাটগাঁ সন্দীপ আর টাঙাইলের ছেলেরা এই রাস্তায় অযথা পায়চারি শুরু করে দেয়— গায়ে তাদের হাত-কাটা গেঞ্জি, পরনে খাকির ট্রাউজার।

ঘরের বাইরে বসে মনোরঞ্জন প্যাম্‌ফ্লেট খসড়া করছিল, আড়-চোখে চেয়ে দেখল একবার এদের। ঘরের মধ্যে থেকে হীরার গুনগুন গলা শুনতে পাচ্ছে সে। বাঁ হাত দিয়ে একমাথা রুক্ষ চুল ধরে উপুড় হয়ে বসে সে হিজিবিজি কি-সব লিখে যাচ্ছে খসখস করে। টান হয়ে বসল মনোরঞ্জন। ইশারা করে ডাকল ওদের।

ওরা বুঝি তৈরিই ছিল, ইশারা পেয়েই এসে গেল কাছে। মনোরঞ্জন বলল, একটা প্ল্যান ঠিক করেছি। এজিটেশন করতে হবে। সঙ্গে লোকজন তেমন পাই নে, কাজ করব কী?

—লোকজনের অভাব? আমরা তো কাজ করার জন্যে মুখিয়ে আছি।

—সত্যি ? চাঙ্গা হয়ে বসল মনোরঞ্জন।

দেখতে-না-দেখতে এক নম্বর ক্যাম্প আগুনের গোলা হয়ে দাঁড়াল। কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেল প্রায় রাতারাতি।

পিসিমা তিন নম্বরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন, বলে এলেন, হীরা আর মনো— এরা থাকতে জারি-জুরি চলবে না কারো। দুই ভাই-বোন মিলে কেমন দল বেঁধেছে দেখে এস একবার— দল না তো, আগুনের ডেলা। তোমাদের এখান থেকে তুলে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের তোলে কার সাধ্যি ! মনো তো খবর পায় সব, শুনে এসেছে— তোমাদের সরাবার জন্যে নাকি চক্রান্ত চলেছে তলে তলে।

লবঙ্গ বলল, সরিয়ে কোথায় পাঠাবে ?

—হীরাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

অবাক হয়ে তাকাল লবঙ্গ। মেয়েমানুষ হয়ে হীরা এত খবর পায় কোথা থেকে, তার চোখে যেন সেই জিজ্ঞাসা জেগে উঠল।

পিসিমা বললেন, ওই তো মজা। কাঁচে আর হীরেয় তফাত তো ওইখেনে।

রামেশ্বরের মেয়ে সে, পৃথিবীর আর দেখল কতটুকু। হাল আর লাঙল, গোলা আর গোরু— এই দিয়ে ছিল তার পৃথিবী ঘেরা। সে পৃথিবীটা এখন চাপে পড়ে আর-একটু ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর ঠিক এইখানেই শেষ কি না, বলা সহজ নয়। তবু এখান থেকে আবার কোথাও সরে যেতে ইচ্ছে করে না তার। নানা জাতের আর নানা জায়গার লোক এসে নাকি ভিড় করে এখানে। হাজার হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে হঠাৎ হয়তো একটা চেনা মুখ সামনে এসে দাঁড়াতেও পারে একদিন। যে-মুখটার কথা সে চোখ বুজে বুজে ভাবে, তা যে কবে আর কী করে আসবে, আর কোথা থেকে— সে হিসেব করার মত বুদ্ধি

তার নেই, যুক্তিও সে খুঁজে দেখে নি কোনোদিন। তবু আশা করতে ক্ষতি কি। তার মনটা এক ঝলকে টেনে-কেড়ে নিয়ে গেল কেন লোকটা। একটা পিশাচের হাত থেকে সে লবঙ্গকে রক্ষা করল, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে কেন সে পারল না— এইটেই হয়তো লবঙ্গর আক্ষেপ। মহাদেবপুর কি এখানে? সেখানে যাবার রাস্তাও তো সহজ নয়, সোজা নয়। এই বাঁকা পথটা ধ'রে লোকটা কেনই-বা গিয়ে হাজির হল সেখানে, মনে মনে এ জিজ্ঞাসাও করে লবঙ্গ।

কিন্তু কাউকে ও খোঁচায় না, কাউকে কিছু বলে না। সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ মানিককে বলে ফেলে সে মনে মনে পস্তাচ্ছে। ছেলেমানুষ তো, কাউকে বলে ফেললেই হল। লজ্জার সীমা থাকবে না তা হলে তার। চোখ-ওঠা তার কমে এসেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়া কমে নি।

মাদারিপুরের পিসিমা বলেন, ঠাণ্ডা লাগলে অমন হয়। চায়ের ভাপ দাও। চা-ই বা পাবে কোথায়। হাঁড়িতে যখন ভাত ফুটবে তখন কাগজের চোঙ দিয়ে সেই ভাপটা দু বেলা চোখে লাগাও, কমে যাবে।

কিন্তু কমে না ওতেও। তার মনে পড়ে মালার কথা— লক্ষ্মীছাড়ী! ওই মেয়েটা নিত্য এসে তাকে খোঁচাত। তার মনে পড়ে মহাদেবপুরের দুর্দশাটার কথা। সেই মড়কের কথা। অনাহারের কথা। সে-ও যেন ভালো ছিল। নিজের ভিটেয় পড়ে শুকিয়ে মরা ভালো, চকচকে এই রাস্তার ধারে, চকমেলানো এই বাড়িগুলোর ভিড়ের মাঝখানে এইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে।

লম্বা বারান্দায় সার সার উনুন জ্বলছে চারটে। চানাচুর তৈরি হচ্ছে। দু-চার পয়সা পাওয়া যাচ্ছে নাকি এতে। রামেশ্বর বলে, এতে যদি শেষবেশ না পোষায় তা হলে কাপড়-গামছা ফিরি করবে। মানিকও

এতে রাজি। কিন্তু তাতে যে টাকা দরকার, সে রেস্ত নেই। তাই প্রাণ ঢেলে চানাচুর তৈরিই চলছে। অংশীদারেরা পাঁচ-সাত টাকা করে এক-একজন ঢেলেছে এ কাজে। খুব উৎসাহ নিয়েই কাজ করতে থাকে, কিন্তু মাদারিপুরের পিসিমা মাঝে-সাঝে এসে তাদের মন ভেঙে দিয়ে যান।

বারান্দার সামনের খোলা জমিতে যুদ্ধ-আমলে লাগানো ফুলের গাছে এখন জল পড়ে না, তবু মাঝে-মাঝে দপ করে এক-আধটা ফুল ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠার জন্যে যেমন ফুল, ঝরে যাবার জন্যেই তেমনি তা ফুল। সকলের চোখের সামনে থেকেও সে সবার দৃষ্টির বাইরে। ফুলের গাছের উপর সুখদা কাঁথা শুকতে দিয়েছ। খোলা জমির ঘাসের উপর মানিকের হাত-কাটা জামা উপুড় হয়ে পড়ে রোদ খাচ্ছে— মনে হচ্ছে, মানিক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওখানে।

বোম্‌পাস হ্রদে বিকাল হয়। আশপাশ থেকে ধীরে-ধীরে লোকজন জড়ো হতে থাকে সেখানে। তিন নম্বরের এই জানলা দিয়ে দেখা যায়। মনে হয়. ওরা বুঝি কলের পুতুল। যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণ জলের চারপাশে এমনি ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াবে। তার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে-ধীরে যখন নেমে আসবে, পেরেকের চকচকে মাথার মত এক-একটা ক'রে যখন আকাশে তারা ফুটবে, আর সেইসঙ্গে বোম্‌পাস হ্রদের চারধারে টুপটুপ করে জলে উঠবে বিজলি-বাতি, তখন ভিড় পাৎলা হতে শুরু করবে। তারও অনেক পড়ে ফিরে আসবে মানিক। আজ ফিরে এলে লবঙ্গ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবছিল। মানিকের খেয়াল আছে তো? রোজ ফিরে এসেই তো কুপী জালিয়ে উবু হয়ে বসে যায় পয়সা গুনতে। তার পরই রামেশ্বররা গোল হয়ে বসে যায় হিসেবে। তার পর কথায় কথায় রাত হয়। তার পর খাওয়া-দাওয়া। তার পর ঘুম। মানিকের ফুরসত কই?

গভীর রাতে রেলের হুইসল বাজে। ধারালো আওয়াজ দিয়ে নিঝুম রাতকে খণ্ডখণ্ড করে কেটে দিয়ে চলে যায় যেন। আরও শোনা যায়, দূর থেকে ভেসে-আসা গুঙানি শব্দ— গঙ্গার জাহাজের। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় এরোপ্লেন। এত পথ খোলা। কিন্তু যাবে কোথায়? কোথাও যাবে না। মাদারিপুরের পিসিমার সেই কথাটা মনে হলেই কেমন আতঙ্ক হয়— তোমাদের সরাবার জন্যে চক্রান্ত চলেছে তলে তলে।

চলুক। পরোয়াই-বা তাতে এমন কী। কিন্তু তার ঋণ। সে যেন ঋণী হয়ে আছে রাজারামের কাছে। লোকটা নিজের প্রাণের মায়া ভুলে ঝাঁপিয়ে এসে তাকে রক্ষে করল, তার ইজ্জত বাঁচিয়ে দিল— একবার তার সামনে দাঁড়িয়ে সে সেটা স্বীকার করতে চায় যেন। এর চেয়ে বেশি কিছু ইচ্ছাও যেন তার নেই। কিন্তু তখনই তার মনে হয়— আছে; আরও একটু বেশি কী যেন আছে তার মনের মধ্যে।

যা সবার জানা, সেইটেই বেশি করে গোপন করার জন্যে লবঙ্গর চেষ্টার শেষ নেই। তাই লোকটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ সে করে না। যা আছে মনের মধ্যে তা মনের মধ্যেই লুকানো থাক্— কাঁচের মত ঝিলিক মরার সাধ কেন। সেদিন পিসিমার কথাটা তার মনে বড় লেগেছে।

লবঙ্গরা যখন তিন নম্বরে এসে আস্তানা নিয়েছে তখন রাজারাম যে মহাপাত্রের সামনে প্রদীপের আলো জেলে বসে আছে— এ খবর তারা জানেও না, তাদের জানার কথাও না। মহাপাত্রের সামনে বসে রাজারাম যখন গাঁয়ের সংবাদ শুনছে, এখানে তখন মানিক হিসাব করছে পয়সার। এখানে কুপীর ধোঁয়া, ওদিকে প্রদীপের শিখা। কিন্তু এই দুই আলো একেবারে তফাত, একেবারে আলাদা। মনে-মনে হয়তো

দুইজন খুঁজছে দুইজনকে। কিন্তু সে খোঁজার পক্ষে এ আলো বুঝি সামান্য, এদের শিখায় বুঝি তেমন জেল্লা নেই।

এলাচ এসে বলল, দিদি, তুই গুমট হয়ে বসে আছিস। বাদাম ভাজবি না?

—কাল হবে, সকালে।

কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সকাল হতে-না-হতেই হীরা এসে হাজির। আজ তিন নম্বর যেন ধন্য হয়ে গেল, এক নম্বরের হীরা এসেছে তাদের ডেরায়। আগে আগে পিসিমা, পিছনে মনোরঞ্জন আর সন্দীপের ছেলেরা।

হীরার গায়ে ফুল-হাতা জামা, চুল ফাঁপিয়ে সিঁথি করা, আলতা-পরা পায়ে স্লিপার, হাতে ব্যাগ। বলল, লোক গুনতে এসেছি।

হেতু?

—শীত এসে পড়ল। কম্বল আদাই করতে হবে না?

এই আশ্বাসে তাকে ঘিরে ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে হীরা বলল, সরে দাঁড়াও সব। মেয়েমানুষ দেখলে আর হুঁশ থাকে না।

পানাপুকুরে যেন ঢিল পড়ল, সবাই সরে গেল দূরে দূরে। কিন্তু কথায় কথায় আবার ভিড়টা ঘন হয়ে এল হীরার উপর।

হীরা ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল, বাহান্নটি পরিবার, গড়ে এক-এক ঘরে সাত জন। তা হলে প্রায় চার-শ কম্বল এখানে দরকার। একটু বেশি ক'রে দাবী করাই ভালো।

তিন নম্বরের আনন্দ ধরে না। শীত নিয়ে যে-ভয়টা ছিল, তা যেন হীরা এক নিমেষে ভেঙে দিয়ে চলে গেল। ওরা চলে গেল, কিন্তু মাসিমা রয়ে গেলেন।

এলাচকে বললেন, ওই আমার ভাইঝি। খুব চালাক-চতুর। দেখার শখ ছিল তোদের, দেখলি তো আজ? লাগল কেমন।

লবঙ্গ বলল, খুব ভালো। আর-একদিন এলে আলাপ করব।

—সময় কই। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলে না, উল্কার মত এল, উল্কার মত চলে গেল। চুলে তেল পড়ে না, গায়ে জল পড়ে না। নাওয়া-খাওয়ার একটা সময় রাখতে তো হয়— তাও নেই। বাধা দিই নে, করুক।

পিসিমা বাড়িয়ে বলেন নি কিছু, যা যা বললেন, সব সত্যি। সত্যিই খুব রুক্ষ দেখাল ওকে। কিন্তু এতদিন পিসিমার কাছে গল্প শুনে চেহারা সম্বন্ধে যা আন্দাজ করেছিল তারা, তার সঙ্গে মিল বিশেষ নেই।

সময় নেই বটে, কিন্তু সময় করে হীরা পরদিন এল। এসেই সরাসরি রামেশ্বরের ঘরে ঢুকে পড়ল। সামনে লবঙ্গকে দেখেই বলল, গ্র্যাণ্ড্।

গ্র্যাণ্ড আবার কি? লবঙ্গ হাঁ করে তাকাল তার মুখের দিকে। হীরা বলল, তুই না কি প্রেম করছিস?

ভড়কে গেল লবঙ্গ। চেনা নেই পরিচয় নেই, হঠাৎ লাফিয়ে এসে গায়ে প'ড়ে এমন ভাব করার মানে? লবঙ্গ তার দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিল না।

হীরা বলল, তোর বাপ গিয়েছিল কাল। পিসিমার কাছে বসে বসে নানান দুঃখের কথা বলছিল। তোর বিয়ের কথা উঠতেই—

চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল লবঙ্গ।

হীরা বলল, তোর বাপ বলল তোর কীর্তির কথা। বেড়ে আছিস মাইরি। আমাদের ভাই জীবনে প্রেম হল না। স্বাদটা কেমন ভাই?

এই বেআড়া কথা শুনে লবঙ্গ বিরক্ত হল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু সে আড়-চোখে তাকাতে লাগল হীরার দিকে। গতকাল এ এসেছিল অন্য বেশে, আর্তসেবায়। আজ এ এসেছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে?

হীরা বলল, প্রেম করে কারা? যাদের পেটে ভাত আছে। কিন্তু খিদেয় যারা ধুঁকছে তাদের আবার প্রেম কি? ওসব বাদ দে। আয় আমাদের সঙ্গে।

—কোথায়?

—কাজে। মনো-দা তোকে পেলে লুফে নেবে। এই চেহারা, এই শরীর— কেন একে নষ্ট করবি? একে দিয়ে খাটিয়ে নে।

বলে কি হীরা? পিসিমা এসে বলে গেছেন, কাজ করা মানেই নিজের হাতে নিজের কবর খোঁড়া, তাঁরই সঙ্গে এক চালের নীচে বাস করে এ বলে কি না কাজ করতে।

হীরা বলল, পেটের খিদে যেমন আছে একটা, শরীরটারও তেমনি খিদে-তেষ্টা আছে— সেটা যেন ভুলিস নে। সেটা মেটাতে প্রেমে পড়তে হয় না।

ঝাঁজ দিয়ে লবঙ্গ বলল, অমন খিদে-তেষ্টা আমার শরীরে নাই। আমি কাজে নামতে চাই না। বেশ আছি।

হীরা বলল, ঘরে বসে থাকলে কি কারো কিছু জোটে, ভাই? পথে বা'র হতে হয়। এই ঘুপচি থেকে বেরিয়ে আলো-হাওয়ার মধ্যে নামতে হয়।

কথাটা কেমন লাগল লবঙ্গর মনে। এভাবে এক কোণে একা-একা বসে থেকে কারো কথা সারাদিন ভেবে তো সত্যিই কোনো লাভ নেই। মানিক একটু এদিক-ওদিক ঘোরে, তাই এদিক-ওদিক নজর রাখার কথা লবঙ্গ বলে ফেলেছে তাকে। আজ দেড় মাস হয়ে গেল

তারা এখানে এসেছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও সে বাইরে একটু পা বাড়ায় নি। এই শহর, কত এর নাম-ডাক, কত দিন থেকে এর কথা শুনে আসছে, কিন্তু এখানে এসে একদিনের জন্যে তো এই শহরের সঙ্গে সে এতটুকু পরিচয় করল না। হীরার দৌলতে যদি সে-কাজটা হয় তা হলে ক্ষতি কি? কিন্তু মেয়েটা কেমন বেআড়া কথা বলছে, ওকে নিয়ে তো ওইটুকুই ভয়।

হীরা বলল, যে খুন করতে পারে সে ভালোবাসতে পারে না। যে ভালোবাসে সে খুন করে না।

—কার কথা বলছ।

—বিশেষ কারো না। এটা একটা সাধারণ কথা। মনো-দাও তোর বাপকে এই কথাই বলছিল আজ। বলছিল, লোকটা নিশ্চয় নাম-করা বোম্বেটে। চোখে দেখি নি, তার সম্বন্ধে চট্ করে কোনো মত দিতে চাই নে, কিন্তু আমারও যেন অমনি মনে হয়।

লবঙ্গ প্রতিবাদ করল না। হীরার কথা কান পেতে শুনে যেতে লাগল কেবল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এ মেয়েটা শীতের কম্বল ছেড়ে দিয়ে, হঠাৎ তার মনের সম্বল হবার জন্যে এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন?

—কত লোক খালাস পেয়ে গেল। সত্যিকারের ঘাগী না হলে ওকেও নিশ্চয় ছেড়ে দিত। কিন্তু ছাড়ে নি তো! ছাড়লে জানতেই পারা যেত।

লবঙ্গ বলে উঠল, কী করে? কী করে জানা যেত?

—রোজ খবরের কাগজ পড়ি না? রাজ্যের খবর রাখছি, আর এই সামান্য খবরটা রাখা এতই শক্ত? আমি বলি কি শোন, আয়। আমাদের সঙ্গে আয়, একটু কাজ করি।

কাঁচে আর হীরেয় যে অনেক তফাত, এটা বোঝে না কেন হীরা। যে-কাজ সে পারে, সেই কাজ লবঙ্গকেও পারতে হবে কী করে। সে একটা ক্ষুদে গাঁয়ের মেয়ে। সে না জানে ভালো করে কথা বলতে, না পারে পাঁচজনের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। ছাগল দিয়ে লাঙল বওয়াবার জন্যে তাকে এমন করে ডাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না সে।

—গাঁয়ের মেয়ে আমি নই? পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কি পেট থেকে পড়েই পেরেছি। অভ্যেস।

গাঁয়ের মেয়ে মালাও— মধুমালা। মালা যা পেরেছে লবঙ্গ তা পারে নি, আজ হীরা যা পারছে সে-কাজও সে পারবে না।

হীরা লবঙ্গকে তাতিয়ে তোলার জন্যে কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল।

—তার মানে?

—মানে আর কি, মানে বেশ মজা। হুটোপাটি ক'রে দিনটা বেশ কাটে, মাইরি বলছি, বিশ্বেরি কিড়ে।

পিসিমা এসেও মাঝে-মাঝে ওস্কান। কিন্তু লবঙ্গ তো রাজি নয়ই, সুখদাও নয়। কেবল রামেশ্বর মাঝে-মাঝে গাঁইগুঁই করে। তার মনে-মনে হয়তো ইচ্ছে, হীরের সঙ্গে লবঙ্গ যাক।

—কদ্দূর? গোল্লায়?—সুখদা রেগে উঠল, বলল, এখানে মহাপাত্র নেই, বুদ্ধি দেবার লোক নেই। একবার নিজের বুদ্ধিতে চলে ঠকেছ, সে-ধাক্কা সামলানো গেছে। আবার যদি এভাবে এগোও, তা হলে আর রক্ষে নেই— সব যাবে।

রামেশ্বরও রেগে উঠল, বলল, যাবেটা আর কি? আছে কি যে যাবে?

না থাক্ কিছু। আঁট হয়ে বসল সুখদা। গোলার ধান চোখে দেখা যায়, কিন্তু নিজের মানটা তো আর চোখে দেখা যায় না। মেয়েকে পথে ছেড়ে দিতে কিছুতেই সে রাজি না, কিছুতেই না।

—মান ধুয়ে জল খাও। শুটকি মাছের মত তো চেহারা হচ্ছে দিনে দিনে, না খেয়ে খেয়ে আরও শুকিয়ে মর।

ঘুঘনিদানা ফিরি করে ফিরে এল মানিক, বলল, আজ পাড়ায় ঢুকেছিলাম, মা। ওদিকে অনেক বাড়ি। কোনোদিন যাই নি, জানতামই না।

রামেশ্বর বলল, মান খোয়া যাচ্ছে না এতে? তোমার ছেলে ফিরিওলা হয়েছে।

মানিক বাপের মুখের দিকে তাকাল। সুখদা জবাব দিল না। মানিকের কাঁধ থেকে ঝোলায়-ভরা হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল। বলল, এতে মান খোয়া যায় না। এটা ব্যাবসা।

রামেশ্বর বলল, হীরা এক চক্কর দিয়ে এলে কত নিয়ে আসে, জান?

—জানি নে। কিন্তু ও-ব্যাবসা লবঙ্গ করবে না।

বোম্‌পাস হ্রদের কিনারে উদ্বাস্তু-শিবিরের ঘরে ঘরে ব্যস্ততা জেগে ওঠে। এ-শিবির নাকি ছেড়ে যেতে হবে, খালি করে দিতে হবে জায়গা। জবরদখল করে যারা এখানে ঘাঁটি নিয়েছে তাদের উচ্ছেদ করা হবে বলে গুজব রটে গেল। ও-পাশের হাসপাতাল এ-পাশ পর্যন্ত নাকি ছড়িয়ে আসবে। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন একস্বরে ভন্‌ভনানি শুরু হয়, তিনটি শিবিরের প্রত্যেক ঘরে তেমনি একই গুঞ্জন বেজে উঠল। মনোরঞ্জনরা বেশি কিছু বলছে না, মাঝে-মাঝে চম্‌কে ওঠার মত করে বলছে— প্রতিরোধ।

হ্রদের জলের ওপারে রেললাইন, রেললাইনের কিনারে ঘনবনের আরম্ভ— সে বনের মাথার উপর দিয়ে প্রত্যহ সূর্যোদয় হয়, প্রতিরোধের ডাক কিন্তু আসে না।

হীরার চেহারা শুকিয়ে আম্‌শির মত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ আর আতঙ্কের ছাপ যেন লেগেই আছে। কিন্তু কেন উদ্বেগ আর কিসের আতঙ্ক, সে কথা তারা কিছু বলে না। বলে, এখান থেকে তুলে দিলে কোথায় যাব, এই চিন্তা।

পিসিমা বলেন, মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না, বড়ই কাহিল হয়ে পড়ছে দিন-কে-দিন। ডাক্তার পুরো বিশ্রাম নিতে বলেছে।

—বাঁচা গেছে। পিসিমা চলে যাওয়া মাত্র সুখদা বলে উঠল, ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়াই ভালো। ও মেয়ে যত না আসে, ততই মঙ্গল।

—কেন, মা। লবঙ্গ যেন না জেনে না বুঝে জিজ্ঞাসা করল।

সুখদা জবাব দিল না। মেয়ের দিকে তাকাল মাত্র একবার। সে চাউনির অর্থ যে একটা আছে তা লবঙ্গর বুঝতে বাকি রইল না। তাই সে চুপ করে গেল।

কিন্তু কোথায়— সুখের না হোক, দুঃখেরই নাহয় হল, এই নীড় ছাড়বার জন্যে এতদিনেও তো কোনো হুমকি এল না তাদের উপর। অকারণে তাদের ব্যস্ত করে তুলে হীরাদের সুবিধে কি হয়, তা রামেশ্বররা বুঝতে পারল না। তারা তাই মনকে একটু নিশ্চিন্ত করে নিয়ে আবার নিজেদের কারখানার কাজে মন দিল নতুন করে।

মাদারিপুরের পিসিমা কিছুদিন থেকে আর আসছেন না। শীতের কম্বল নিয়ে হীরারাও আর এল না। হীরার আসা তো বন্ধ, ডাক্তারের কথামত সে এখন পুরো বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু তার মনো-দাও তো এল না।

মানিক ফিরি করতে বেরিয়ে যাবার পর লবঙ্গ এলাচকে নিয়ে

বেরল। বেশি দূর নয়, এই রাস্তাটার ওপারে। আজ তার প্রথম পথে বার হওয়া। সুখদা বলে দিয়েছে সাবধানে যেতে। না বলে দিলেও নিশ্চয়ি সাবধান-মতই যেত। মনটা কেমন-যেন আরামে ভরে যাচ্ছে। ওই যে বনের মাথা দিয়ে চাঁদ উঠে আসছে, তা দেখে কি মনে পড়ে না মহাদেবপুরের কথা। পদ্মার ওপার থেকে শিবমন্দিরের মাথার উপর দিয়ে যখন চাঁদ ওঠে তখন সে-চাঁদকে দেখতে হয়তো এর চেয়ে একটু বেশি ভালো লাগে। কিন্তু আজই-বা মন্দ লাগছে কি। ঘরের ঘুপচি থেকে বেরিয়ে এসে আজ যেন তার মনের উপর বাতাস খেলে গেল। মহাদেবপুরের স্মৃতিগুলো তাকে যেন জড়িয়ে ধরতে লাগল নিবিড় করে। লবঙ্গ বলল, এখন যদি কেউ কাজ্‌রি গায়!

এলাচ বলল, কে গাইবে?

কেউ না। কারো নাম করতে চায় না লবঙ্গ। এলাচের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলল, আয়, বসি এখেনে। এই ঘাসের উপর। ঠিক পদ্মার ধারটার কথা মনে পড়ে।

রেললাইনের ওপারে গোবিন্দপুরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। চেনা শব্দ, একেবারে পরিচিত শব্দ। তাদের শিবমন্দিরেও এখন বুঝি ঘণ্টা বাজছে। বাজছে কি? কে বাজাবে সে ঘণ্টা?

মহাপাত্তর তো এখন সেখানে একেবারেই একা। মহাপাত্র!

লবঙ্গ বলল, মনটা বড় খারাপ।

—কেন রে? কিঁ হল।

—হবে আর কি? কিন্তু এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না কোথাও। দেশে ফিরতে ইচ্ছে করছে। মাকে বললেই মা কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়, তাই কিছু বলি নে। দেশে আর ফেরা যাবে কি না, কে জানে।

এলাচ উত্তর দিল না। দেশের কথা উঠলে তারও মন আনচান করে ওঠে, কিন্তু তা নিয়ে মন খারাপ করতে সে চায় না। তাই বোধ হয় চুপ করে থাকে।

একবার তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, আবার ফিরে এল, কে এই লোকটা? লবঙ্গ একবার চাইল লোকটার দিকে। লম্বা চওড়া শক্ত আর জোয়ান লোকটা। বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠল লবঙ্গর। ঠিক যেন রাজা, অবিকল রাজা। উঠে দাঁড়াবার জন্যে তৈরি হল লবঙ্গ। অমনি লোকটা শিস দিল।

লবঙ্গ এলাচকে বলল, বাড়ি চল। এখানে বসা যাবে না।

—কেন, হল কি?

—দেখছিস নে, লোকটা ঘুরঘুর করছে। কি মতলব কে জানে। চেয়ে ছাখ, অবিকল তোর রাজাদার মত দেখতে। তাই না?

দুটি মেয়ে ঘাসের উপর বসে আছে, বোম্‌পাস হ্রদের কিনারের পায়ে-মাড়ানো নির্জীব ঘাসের উপর। ঠিক যেন খাপ খায় নি তারা এই ঘাস আর বিজলি বাতির ঠিকরে-আসা আলোর সঙ্গে, এখানে যেন তারা বেখাপ বেমানান। পল্লীটা অভিজাত, এখানে যারা ঘাসের উপর বসে বিশ্রম্ভালাপ করে, যারা এখানে সন্ধ্যাযাপন করে— তাদের সাজ আর বসার ধরন আলাদা। এমন সহজ আর সরল নয় সে ধরনটা।

এরা যখন বেখাপ, এদের তখন বেআড়া প্রশ্ন করা হয়তো যায়। লোকটা কাছে এসে বসে পড়ল, বলল, যাবে নাকি?

লবঙ্গ লোকটার মুখ দেখে নিল, যা সে ভেবেছিল এ তো তা নয়। কিন্তু লোকটা বলে কি? এখান থেকে উঠে যেতে বলছে নাকি?

জবাব না পেয়ে লোকটা অনর্গল কতকগুলো বিশ্রী কথা বলতে লাগল।

এতক্ষণে বুঝতে পারল লবঙ্গ। এই অভিজাত পল্লীতে এই স্বচ্ছ জলের কিনারে এমন কদর্য কঙ্কালও আছে— এইটেই তার কাছে যেন বিস্ময়।

লবঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল।

লোকটা আগে আগে হাঁটছিল, কয়েক পা গিয়েই একটু থেমে ওদের পাশাপাশি হল। এলাচ ডান হাত দিয়ে দিদির বাঁ হাতটা ধরে আছে। কোথায় চলেছে তারা, তা জানে-না আদপে। লবঙ্গ জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করতেই লোকটা বলল, অত তাড়া কি গো। সবুর কর, আমরাও যাব যে।

জবাব দিল না লবঙ্গ। মনে-মনে সে শক্ত হল। একটু আগে যাকে রাজা বলে সে মনে করছিল, যার উপর এক মুহূর্তের জন্য একটা সম্ভ্রম দেখা দিয়েছিল তার মনে, তার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শোনার জন্যে সে যেন তৈরি ছিল না।

লবঙ্গ চেয়ে দেখল চার দিক— লোকজন আছে। একেবারে অসহায় বলে বোধ হল না নিজেদের। লোকটা পাশে-পাশে হাঁটছে, আর ফিস্ ফিস্ করে কী-সব যেন বলছে, সেসব কথা উচ্চারণ করা যায় না। ওই রাস্তাটা দিয়ে গেলে সদর রাস্তায় পড়া যাবে, যে রাস্তায় বাস্ চলে। তারা সরু পথটা ধরতেই লোকটা লবঙ্গর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল।

এক ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে লবঙ্গ বেপরোয়া হয়ে লোকটার গালে চড় কষে দিল একটা। ঠিক এমনি করেই টাইগারকে মার দিয়েছিল কে যেন! লবঙ্গরা তরতর করে হেঁটে চলল। লোকটা আর এগোল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত।

এলাচ বলল, শিগগির দিদি শিগগির।

—শিগগির করেই তো হাঁটছি। আবার কত জোরে হাঁটব।

বোম্‌পাস হ্রদের কিনারে এ রকম ঘটনা নিত্য ঘটে কি না, কে তার খবর রাখতে গেছে। কিন্তু লবঙ্গর বুকের মধ্যে এই রকম একটা গর্জন নিত্য বাজতে থাকে। তার মন যেন হাল্কা হয়ে গেছে অনেক। একদিন তার রক্ষক হয়ে যে হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আর তার সম্মুখে নেই, তাই আজ নিজেকে নিজে রক্ষা করা ছাড়া তার উপায় কি? কিন্তু সারাটা জীবন সে নিজেকে এভাবে কী করে আগ্‌লে থাকবে? রাজার খবর যেন তার চাইই। তার কেবলই মনে হচ্ছে— খালাস সে পেয়েছে। হীরা যা-ই বলুক-না কেন, বিশ্বাস হয় না লবঙ্গর। রাজা যে খুনী নয়, সে তার জানা আছে। একমাত্র চিনেছে তাকে মহাপাত্র, এমনকি তার বাপও রাজাকে ভালো করে চিনতে পারল না— এটা কম আক্ষেপ নয় লবঙ্গর। সে আনাড়ি, লেখাপড়া জানে না, হাতের কাজ শেখে নি, একা পথে বার হবার সাহস তার নেই— তাই তার ভয়, তার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার বাপ মাদারিপুরের পিসিমার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা-কিছু করে না বসে।

পিসিমাও আসছেন না, নতুন খবরও পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। তিনি বেশি এলেও ভালো লাগে না, একদম না এলেও সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মাঝে-মাঝে এলে পারেন কিন্তু।

পিসিমা এলেন। কোনো ভূমিকা না করে বললেন, চাষাদের দিয়ে চাষের বন্দোবস্ত করার জন্যে সব উঠে-পড়ে লেগে গেছে, শুনেছ তো?

সুখদা বলল, না তো!

রামেশ্বর বলল, সত্যি কথা? আমরা জাত-চাষা, ঘুঘনিদানা বেচে রংচঙে বেলুন ফিরি করে পেট ভরাতে পারি, মন ভরে না তাতে।

—মন প্রাণ ভরপুর হয়ে যাবে এবার। ভাবতে হবে না। জমির খোঁজ হচ্ছে। বলদ তো আছেই। পিসিমা চোখ ঘুরিয়ে হাসেন।

—বলদ কোথায় ?

—কেন, তিন নম্বর ভরতি। তোমরাই তো এক-একটা আস্ত বলদ। দুঃসংবাদ দিতে এলাম, তোমরা আনন্দে নেত্য জুড়ে দিলে। গলায় হার নেই, থাকলে হয়তো তাও খুলে দিতে। সব কলির কৈকেয়ীর দল তোমরা।

রামেশ্বর বুঝল চিম্‌টিটা কোথায়। তাই একটু ভাবিত হল। বলল, জমি কোথায় খুঁজছে ?

—ক হাত জমি চাও ? পাঁচ হাত হলেই তো দিব্যি চলে যায় তোমার। তার আর খোঁজাখুঁজির কি ? আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে, গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া উঠছে, সার সার চুল্লি জ্বলছে— ঝাঁপিয়ে পড় গিয়ে।

ইশ। মুখের সামনে দাঁড়ানো যায় না মাদারিপুরের পিসিমার। মুখে ঝাঁজ বড় বেশি। তাঁর হীরা, হীরার নামে কেচ্ছা করে কে ? যাদের চুলোর দুয়োরে নাই কিছু, তারা।

হীরা-প্রসঙ্গ হঠাৎ কেন তোলেন পিসিমা বলা শক্ত। মাঝখানে কিছুদিন বনবন করে ঘুরে বেরিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে। তার কথা কেউ মনেও রাখে নি, কেউ তার কথা তোলেও না। এ-সত্ত্বেও ঝাঁজ দিয়ে পিসিমা তার কথা তোলেন কেন।

লবঙ্গকে হীরা যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে, সেকথা লবঙ্গর হঠাৎ মনে হয়। শরীরের খিদে মেটাতে গিয়েই খানায় পা পড়ল না কি তার, বলা শক্ত। কানাঘুষোয় একটু-আধটু যেন তেমনি শোনা গেছে।

ভাতে স্বাদ না পেলে লঙ্কা ঘষে নিলে নাকি স্বাদ বাড়ে। যাদের বাড়ে তাদের বাড়ে। পিসিমা বুঝি তাই কথায় কথায় কেবল ঝাঁজ

ঘষে বেড়াচ্ছেন আজকাল। হীরা তাঁর সব দেমাক বিস্বাদ করে দিয়েছে হয়তো-বা।

তিন নম্বরের বেসাতি চলেছে লাগারে। ঘরে লঙ্কা গুঁড়িয়ে নিলে সস্তা পড়ে, কিন্তু হামানদিস্তা নেই। বাজার থেকে ঠোঙাভরতি করে গুঁড়ো লঙ্কা কিনে এনে বাসী বাদামে এন্তার মেশানো হচ্ছে। মহাদেব-পুরের মতো জায়গায় যদি চমচমে ময়দার গুঁড়োর ভেজাল দেওয়া চলে, তবে এখানে ঝাল-মরিচ দিয়ে বাসী চানা বাজারে চালালে ক্ষতি কি ?

বেসাতি চলেছে একটানা, কিন্তু মনের কারবার সত্যিই কি মাটি হয়ে যাবে ? দিনের পর দিন বয়ে চলেছে, কিন্তু মনকে বিলিয়ে দেবার মত মানুষ কোথায় ? লবঙ্গর মন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

সেদিন লোকটার গালে মোক্ষম চড় কষে দেওয়া এস্তোক তার মন অনেকটা হাল্কা হয়েছে যেমন, আবার ভারিও ঠেকছে সেই অনুপাতে। রাজার কথাটা সেই থেকে মনে পড়ছে বড় বেশি করে। বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে এই অজানা দেশ সম্বন্ধে তার যে ভয়টা ছিল, সেদিনের ঘটনার পর তাও যেন কেটে গেছে অনেকটা। এর মধ্যে একদিন সে মানিকের সঙ্গে গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, গোল-পার্কটার চারদিকে ঘুরেছে কিছুক্ষণ। কত লোকজন যাচ্ছে আসছে— তার কোনো হিসেব নেই। মাথার উপরে জ্বলছে আলো। সেই আলোর দিকে ঘাড় তুলে তাকাল লবঙ্গ।

এমন সময় ঠিক এমনি ভাবেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে এখান থেকে অনেক দূরে কলকাতার উত্তর অঞ্চলে হাতিবাগানের মোড়ে একজন উপর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বেশ শাঁসালো বলেই যেন মনে হয়।

তার পাশে এসে দাঁড়াল আর-একজন, ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, বেলগাছিয়ার গাড়ি এ পথ দিয়ে যাবে কি না।

জবাব পেয়ে লোকটা তো চলে গেল। কিন্তু এ কি, শাঁসালো লোকটার পকেট সাফ হয়ে গেছে। তিনি চারদিক তাকালেন, কিন্তু কাউকে পেলেন না আর। সব-ক'টা পকেট হাটকে হাটকেও আর-কিছু পাওয়া গেল না খুঁজে! বিজলি বাতিগুলো সরষের ফুলের মত হয়ে এল তাঁর চোখে।

রাজারাম ইতিমধ্যে হাওয়া। তার হাতেও এখন কিছু নেই। মালটা হাত-বদলি হয়ে গেছে।

রাজধানী দিল্লীতে মণিলালের চোখে ধুলো দিয়ে এমনি করেই হাওয়া হয়েছিল বুঝি রাজারাম। জীবনে তার যা-কিছু টান ছিল, যেটুকু মায়া আর মমতা ছিল, এক ঝটকায় তার সব-কিছু থেকে হঠাৎ রেহাই পেয়ে সে মুষড়ে গিয়েছিল। টান গিয়েও যেন যায় নি সবটা— মাঝে-মাঝে মনে পড়ে খড়কে-ডুরেটা রুপোর বালাটা আর নাকছাবিটার কথা। তাই ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে তাকে এসে পড়তে হল এই আর-এক মহানগরীতে— এই কলকাতায়।

হাওড়ায়, এ কি, চেনা লোক— বেরিলি-জেলের সাঙাত হরবিলাস। তার সাঙাতের তো ছাড়া পাবার কথা ছিল না, এ যে সত্যিকারের খুনী ছিল। সতিকারেব খুনী সে ছিল বটে, তবু ভাব ছিল রাজার সঙ্গে খুব। মুষড়ে পড়লে মন চাঙা করে দেবার কারদানি খুব ভালো জানে হরবিলাস।

হরবিলাসকে দেখেই রাজারাম আহ্লাদে গদগদ হয়ে তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েছিল, এমন সময় হরবিলাস, কাছে এসে বলল, চুপ। চলে আয়।

পাশাপাশি যেতে যেতে রাজারাম বলল, ছাড়া পেয়ে গেলি ?

—হুঁ। পাঁচিল টপকে। দেশ আজাদ হল, আমি আটক থাকি কেন। চলে আয়।

চলে আয় চলে আয় ব'লে হরবিলাস তাকে নিয়ে চলেছে কোথায় ? জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই, জানতে চাইলেই হরবিলাস বলে, চুপ, চলে আয়।

নতুন জায়গা। এর পথঘাট গলিঘুঁজি লোকজন কিছুই চেনা নেই রাজারামের। কিন্তু হরবিলাসই-বা এ-জায়গার চেনে কতটুকু ? তার মুলুক না কাশী— বেনারস। সেখানেই সে নাকি ধরা পড়ে, সেখানেই তার নাকি বিচার হয়।

আকাশ-ছোঁয়া ব্রিজ। লোহার মোটা ফ্রেম দৈত্যের মত আকাশ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক থেকে আলোর বন্যা এসে পড়েছে ব্রিজের উপর। রূপালি রং করা, না, এ রুপোর ব্রিজ ?

ব্রিজ পাড়ি দিতে দিতে হরবিলাস বলল, তোর রূপের বালার খবর কি ? দেখা-সাক্ষাৎ করিস নি বুঝি ?

রূপের বালা তো সে নয়, হাতে ছিল তার রুপোর বালা। রাজারাম বলল, সব বলব।

—অনেক কথা আছে বুঝি ?

—অনেক কথা।

হরবিলাস বলল, বাপ মা ? তোর বহিন রুক্মিণী।

রাজারাম বলল, সব বলব।

—অনেক কথা আছে বুঝি ?

—অনেক কথা।

হরবিলাস এত কথা বলছে, কিন্তু এতক্ষণও একবারও তার গলার স্বর

বদলাল না। কেমন নতুন লাগছে রাজারামের। জেলে তো একই স্বরে একসঙ্গে এত কথা সে কোনো দিন বলতে পারত না। রামধনুর মত সাত-রঙা গলা তার। কথায় কথায় তার গলার রং বদল হয়। কিন্তু আজ এ কেবল একরঙা স্বরেই কথা বলে চলেছে।

গঙ্গা পার হয়ে এল দু জন। এপারে এসে জেটির গা দিয়ে বরাবর হেঁটে চলল দু জন পাশাপাশি। দু জন আর-কোনো কথা বলছে না। দু জনই আলাদা আলাদা ভাবে মনে মনে প্যাঁচ আঁটছে বোধ হয়।

হরবিলাস বলল, রেস্ত কিছু আছে ? আজ রাত কাটাবার মত ?

—টাকা নেই। পয়সা আছে।

—ব্যস্। আহ্লাদে হরবিলাস রাজারামের পিঠের উপর চাপড় দিল। কিন্তু আশ্চর্য, এতক্ষণে তার গলা দিয়ে স্বর বার হল টিয়াপাখির গলার শব্দের মত।

জেলখানায় এ-ই ছিল হরবোলা। মাতিয়ে রাখত, তাতিয়ে রাখত এ সকলকে। কেউ মন-মরা হয়ে পড়লেই নানান স্বরে কথা বলে বলে তাকে চাঙ্গা করে তবে ছাড়ত এই হরবিলাস। তার নামটা তাই বদল হয়ে হরবোলা হয়ে গিয়েছিল। সেই নামে ডাকল রাজারাম অনেকদিন বাদে, বলল, হরবোলা, আজ রাতটা নাহয় কাটবে ; কিন্তু কাল। কালের রেস্ত কই ?

—জোগাড় হবে। পকেট কাটব।

—পকেট কাটবি ? চমকে উঠল রাজারাম, বলল, পারবি ?

—খুব। তুইও পারবি। খিদে পেলে বাঘে নাকি ধান খায়, মানুষে নাকি ফ্যান গেলে, তুইই তো গল্প করেছিস।

করেছিল বটে রাজারাম। কিন্তু সেসব তো গল্প নয়, সত্যি

কথা। চোখে-দেখা সত্যি। রাজারামের মনটা খচখচ করতে লাগল। কিন্তু মনকে এত নরম হতে দিলে চলবে কেন ?

ওদিকে জাহাজের চোঙ দিয়ে কালো চাপচাপ ধোঁয়া বার হচ্ছে ইস্টিমারের ধোঁয়ার মত। এদিকে নির্জন রাস্তা দিয়ে তীরবেগে এক-একটা গাড়ি ছুটে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এক ঠোঙা ঝাল চানা কিনে নিয়ে দুজনে ইডেন-গার্ডেনের পাশের ফুটপাথে উবু হয়ে বসে চিবতে লাগল।

হীরাও শুয়ে শুয়ে চানা চিবচ্ছে তখন। তার পিসি তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে এক মুঠো নিয়ে এসেছে ফাউ। মুখে যার স্বাদ নেই, ঝাল লঙ্কা তার রোচে ভালো। হীরাকে নিয়ে পিসিমা জড়িয়ে পড়েছেন, একথা যতই তিনি বুঝতে পারেন ততই তিনি ঝাঁজ দিয়ে আসেন এদিকে ওদিকে ; পরামর্শ দিয়ে আসেন, কি ওষুদ দিলে চোখের জল পড়া কমে।

মহানগরীতে একই সময় সন্ধ্যা-সকাল হয়— এই নগরীটা পৃথিবীর একই পিঠে বসানো। কিন্তু এ বোধ বুঝি সকলের সমান নয়। এর একদিকে যখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসে, তখন যে আর-এক দিকে আলো ফুটে ওঠে না, তা হয়তো বিশ্বাস করে না সকলে।

লবঙ্গর মনের মধ্যেটা যখন দুঃসহ আক্ষেপে অধীর হয়ে ওঠে, তখন রাজারাম হরবিলাসের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে না, সেও গুমট হয়ে বসে তার আক্ষেপের কথাই বলে তাকে। কিন্তু এই আক্ষেপকে বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়তো কারো নয়।

মহাপাত্রের কথা মনে হয় রাজারামের। কিন্তু তাঁকে আর মুখ দেখাবার ইচ্ছে তার নেই, উপায়ও হয়তো নেই। এখন সে নেমে গেছে অনেক নীচে। মহাপাত্রের কথামত সে ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছে কয়েকটা জায়গা— কাঁচড়াপাড়া শান্তিপুর বাইগাছি। কিন্তু সেখানে যারা আছে, তারা-সব এসেছে অন্যখান থেকে। মহাদেবপুর কিষ্টপুরী ধানকোড়া বাইনাজুড়ি শিবলা— তার এই চেনা গাঁ থেকে ছিট্‌কে-আসা কেউ নেই সেখানে। সে আর খুঁজবে কোথায়। এক-এক সময় মন চাঙ্গা করে নেয়, ঠিক করে খুঁজে বা'র সে করবেই। অকারণেই যেন মনে হয়, আছে তার কাছে-ভিতে কোথাও। কেন এ কথা মনে হয়, তা সে জানে না ; মনে করতে ভালো লাগে বলেই বুঝি এমনি মনে করে। মহাপাত্র বলেছেন, লবঙ্গও সব জানে। সব যদি সে জানেই, তবে রাজারামকে খুঁজে সে বা'র করছে না কেন। হরবিলাসের মত সে তো ভয়ে-ভয়ে চলা-ফেরা করে না, সে তো গা-ঢাকা দিয়ে নেই এখানে। সে খোলা রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। একদিন দূর থেকে চট করে দেখে ফেলুক তাকে।

বোম্‌পাস হ্রদে হঠাৎ কান্না বেজে ওঠে নতুন আগন্তুকের। পৃথিবীতে আসা মাত্র সে বুঝি ভড়কে গেছে একেবারে।

লবঙ্গও তো হীরার মত আর লুকিয়ে নেই, সেও তো পথে বার হচ্ছে আজকাল, কেউ তাকে দেখে ফেলছে না কেন। এমন কথা লবঙ্গও হয়তো ভাবতে পারে।

হরবোলার জন্যেও চিন্তা হয় রাজারামের। হঠাৎ একদিন যদি ধরা পড়ে যায় ও, তা হলে পৃথিবীতে আর-কোনো বন্ধু থাকবে না তার। একেবারে অসহায় ও নিঃসম্বল হয়ে যাবে সে। বাপ-মা ভাই-বহিন— সকলে খোয়া গেছে, মায়া বলে তার আর কিছু নেই ; কিন্তু

তবুও যেন চায় হরবিলাসটা থাক্। সে সত্যিকারের খুনীই হোক আর যাই হোক, রাজারাম তাকে ছাড়তে রাজি না।

হরবিলাস বলল, ঘাবড়াও মৎ। আমাকে ধরার জন্যে ওদের বুঝি ঘুম নেই? আমি ওদের কি করেছি যে আমাকে ওরা ধরার জন্যে ফাঁদ পাতবে। মেয়াদ ফুরালে তো ছেড়ে দিতই। আমি আর টিকতে পারলাম না বলে পালালাম।

—কাদের ক্ষতির কথা বলছিস, হরবোলা।

—দেশের। আমি যা ক্ষতি করেছি, সে আমার নিজের ক্ষতি। আমি খুনী হয়েছি। সেই শ্বেতী বুড়িটার জন্যে—

হরবোলা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবছে সে। মানুষ খুন করে যারা তারাও আবার ভাবনা-চিন্তা করে নাকি! হরবোলা তার বন্ধু বটে, হরবোলা তাকে রোজগার করার পথ বাৎলে দিয়েছে বটে, তবু রাজারাম তাকে বিস্ময়ের চোখেই দেখে বরাবর। এ বিস্ময়টা সম্ভ্রমের কি না, তা সঠিক ধরা যায় না।

—আমি যদি ধরা পড়ে যাই একদিন। এক-এক সময় হাত কিন্তু কেঁপে যায়। অন্যের পকেটে হাত পুরে দেওয়াটা— বুঝলি নে।

হরবিলাস হাসল, তাকে পকেটমারার কায়দা বুঝিয়ে দিতে লাগল। বলে দিল, ধরা-পড়ার মত হলেই হাতের মাল খালাস করে দিতে হবে, দৌড়নো বারণ, মার খেয়েও মুখে রা যেন বা'র না হয়। তবেই আর ফাটকে যেতে হবে না। রাস্তায়ই নগদ বিচার হয়ে যাবে।

ঠিক। রাজারাম রপ্ত করে নিয়েছে। খুব বেশি একটা খাঁই ছিল না, খুব বড় একটা দলের মধ্যেও ভিড়ে পড়ে নি। তাদের কোম্পানি ছোট, অংশীদার মাত্র দু জন। দু জন যা টেনে-কেড়ে আনত দু জনের তাতেই কুলিয়ে যেত। কিন্তু কুলানোরও আবার

নাকি রকম আছে। ক্রমে ক্রমে খাঁকতি নাকি বেড়ে যায় সবারই, কাপড় দিয়ে ছেঁকে পুঁটি ধরতে ধরতে হঠাৎ জাল ছড়িয়ে রাঘব-বোয়াল ধরার সাধ যায় না কার? আগের চেয়ে কিছু বড় শিকারের খোঁজে তাদের ওঁৎ পেতে থাকতে দেখা যায় এখন।

বড় পোস্টআপিসের উলটো দিকে ট্রামের ছোট শেডটায় তারা রাত কাটাত দু জন। দু জন সারাটা দিন বড়বাজারের ভিড়ে আর অফিস অঞ্চলের মাঝখানে ঘুরত, আর সন্ধ্যের পর এসে মিলত এখানে। এখন এরা একটা আস্তানা জুটিয়ে নিয়েছে হাতিবাগানে নাথুবাবুর বস্তীতে। পুরনো বস্তী। মেরামতের কাজ হয়নি অনেক দিন। বাতার বেড়া চারধারে, উপরে টালি। এখানে নানা ধরনের ও নানা কাজ-কারবারের লোক থাকে। কেউ কুলী, কেউ কামার, কেউ নাপিত, কেউ-বা মটোর-মেকানিক। তাদের মধ্যে এরা দু জন মিশে গেল।

হরবিলাস বলল, কারবার ভালোই চলছে বলতে হবে, তাই না? ছিলেম পথের, হলেম ঘরের। আস্তানা জুটল তা হলে।

হরবিলাস অনেক প্ল্যানের গল্প করে, বলে, মোটা রকমের একটা দাঁও যদি মারা যায় তা হলে নাথুবাবুর বস্তী কেন, হরবিলাসবাবুর বস্তী করে ফেলব একটা। একটা বস্তী করে বসতে পারলে আর ভাবনা কি।

কিন্তু রাজারামের প্ল্যান নাকি অন্য। সে নাকি চায় আরো কি! সে পাকা দালান দিয়ে একেবারে ভদ্দর লোক হয়ে যাবে, তার পর সেই নতুন রাজারাম গিয়ে টেনে আনবে মহাপাত্রকে। লোকটা একা পড়ে পচবে কেন সেখানে। কবেকার কোন্-এক কৌশল্যা, তার জন্যে প্রাণটা জাহান্নমে দিতে হবে কেন।

আশ্চর্য, রাজারামের মন থেকে তা হলে সব কি মুছে যাচ্ছে একে একে? সে কি সব তা হলে তুচ্ছ করে দিচ্ছে একেবারে, সে কি তবে

ব্যর্থ করে দিচ্ছে তার এতদিনের কামনা আর বাসনাকে? লাহিড়ি-ইস্পাহানি কোম্পানির সড়কের ধারের গুম্‌টি থেকে যে-চোখে যাকে সে দেখেছিল একদিন, সে-চোখকে আর তাকে কি তা হলে রাজারাম অস্বীকার করতে শুরু করেছে।

হয়তো তাই। রোজগার তার যত বাড়ছে, রোজগার তত বেশি বাড়াবার জন্যে তার চেষ্টা বাড়ছে সেই অনুপাতে। নিদারুণ নির্দয় হয়ে উঠছে সে ধীরে ধীরে। সেদিন একটা সোনার সরু হার এনে হাজির।

—কোত্থেকে? হরবিলাস মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা করল।

—এক হ্যাঁচকা টানে। এইটুকু একটা মেয়ে, আশেপাশে কেউ নেই। মওকা ছাড়ি কখনো? কাৎরে কেঁদে উঠল মেয়েটা, হয়তো ফাঁস লেগেছিল গলায়।

হরবিলাস বলল, ঠিক আছে। হাত পাকছে তা হলে। বাড়ি তুই করবিই। হরবিলাস আনন্দে গেয়ে উঠল—

দিলমেঁ বহৎ খুস হামারা
সোনা রুপা আ যা!
ফকীর বনে আজ রাজা!

রাজাও সে আনন্দে যোগ দিল। হাঁটু দুটো দু হাতে বাজিয়ে সে তাল দিয়ে উঠল হরবিলাসের গানে। একই কলি বার বার গাইতে লাগল হরবিলাস।

হাতে হারিকেন নিয়ে মটোর-মেকানিক ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, এত গান কেন হে?

রাজা জবাব দিল, বলল, দিলমেঁ বহৎ খুস হামারা।

বস্তী অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে বাস করে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক। ঘরে তিষ্ঠানো কষ্ট, তাই সবাই বারান্দায় বসে বসে গাঁজা-

তামুক খায়, আর গা চুলকোয়। রাতে খাটিয়া টেনে এনে বাইরে টানটান হয়ে শুয়ে রাত কাটায়।

মাদারিপুরের পিসিমার বিষদাঁত বুঝি ভেঙে গেছে। তিনি তিন নম্বরে বড়-একটা আর আসেন না। যদি-বা কদাচিৎ আসেন, ঝাঁজ দিয়ে কথা আর বলেন না।

চানাচুর আর ঘুঘনির ব্যাবসায় মন্দা পড়েছে। ব্যাবসাদারেরা ধুঁকে গিয়েছে হয়তো। তা ছাড়া, নতুন খবর শুনেছে তারা। তাদের নাকি ছাড়তেই হবে এ-ডেরা। তাদের অন্যত্র নিয়ে যাবার আয়োজন প্রায় নাকি তৈরি। লবঙ্গরা তবে চলেই যাবে? একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে যাবে সব। আশার একটা শিখাও হয়তো-বা ছিল, তাও দপ করে নিবে যাবে একেবারে।

মানিক বলে, সেই ভালো। চাষ-আবাদই ভালো। নতুন কোথাও নিয়ে যদি যায়, যাব।

নাথুবাবুর বস্তীতে যখন খোল-করতাল বেজে ওঠে, তখন তিন-নম্বর বস্তীতে গান ধরে না কেউ। স্তব্ধ হয়ে থাকে তিন নম্বর। একটা প্রচণ্ড ঝড়ের আগে গাছপালারা যেমন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি।

সুখদা মেয়েকে আড়ালে বলে, ভুলে যা। মনে এক-একটা দাগ পড়ে, মুছে ফেলতে হয়।

লবঙ্গ জবাব দেয় না। তারা যেমন এখান থেকে তল্পী গুটিয়ে চলে যাবে এক সুদূর স্বপ্নের দেশে, তার মনের মধ্যে থেকেও তেমনি তল্পী

গুটিয়ে সুদূর স্বপ্নের দেশে পাঠিয়ে দেবে নাকি সব? তা যদি দিতে হয়, দেবে। কিন্তু লোকটা তার মনকে এমন আঁকড়ে ধরল কী করে, এইটেই যেন তার জিজ্ঞাসা।

—আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, রাজারাম। হরবিলাস খোল-করতালের কোলাহলের মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করে, তুই এত বদলে যাচ্ছিস কী করে। ওরা সব পাগল, ওরা ধেই ধেই করে নাচতে পারে, তা ব'লে তুইও নাচবি?

রাজারাম মাথা নেড়ে সুর করে জবাব দেয়, দিলমেঁ বহুৎ খুস হামারা।

পাঁড়েজি ভারিক্কে ধরনে বসে করতাল টুংটুং করেন, মটোর-মেকানিক দিগম্বর পেটের মধ্যে খোলটা চেপে নিয়ে ডানে বাঁয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হারিকেনটার চারদিকে পাক খায় আর নাচে।

বস্তীর সন্ধ্যার মৌতাত এটা। এ ছাড়া আরও মৌতাত আছে। কৃষ্ণেন্দুর হাত থেকে ছোঁ মেরে গেলাশটা কেড়ে নিয়ে রাজারাম চোঁচোঁ করে মেরে দেয় খানিকটা। তার পর টলে টলে পড়ে, আর গেয়ে গেয়ে ওঠে খোলের তালে তালে। আনন্দে জমজমাট হয়ে ওঠে নাথুবাবুর বস্তী।

নাথুবাবুর বস্তীতে আর তিন নম্বরে ফারাক আকাশ-পাতাল। হারিকেনের চারধার ঘিরে এখানে চলেছে নাচের আর গানের হল্লা। ওখানে তখন ধোঁয়াটে আলোর চারধার ঘিরে একটা গোটা পরিবার তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়ের একটা স্বপ্ন বুনছে। ঘরের চারধারে দেয়ালে তাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে, সেই ছায়াগুলো কুপির শিখার সঙ্গেসঙ্গে দেয়ালের উপর দুলছে।

মহানগরীতে একই সময় সন্ধ্যা-সকাল হয়, একই পৃথিবীর একই

পিঠে এটা নাকি বসানো। কিন্তু এখন তার হঠাৎ বদল হল কেন, তার জবাব হয়তো নেই কিছু।

গান যেই থেমে যায় অমনি রাজারাম হয়ে যায় যেন আলাদা মানুষ। সে বলে, খুন করা ভালো, কিন্তু খুন না ক'রে খুনী হওয়া—

—তার মানে ?

—তার মানে ? রাজারাম বলে, তার মানে তুই সাচ্চা, আমি ঝুটা। বিলকুল ঝুটা। খুনও করা হল না, মুফৎ খুনী হওয়া হল। লাভ হল কি ? ফাটক হল, খালাস হল। তাতে ফয়দা কি ? খালাস হয়ে দেখি, তুনিয়া ফাঁকা বনে গেছে, একদম ফাঁকা।

গুম হয়ে বসে রইল রাজারাম। মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে নিশ্চয়। তু হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকতে থাকতে হরবোলাকে চেপে ধ'রে বলল, উঠ, ঘরে চ।

হরবিলাস রাজাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে মেঝেতে ফেলে রাখল।

হরবিলাস রাজারামের কথা ভাবছিল। নিজের কথা সে আর ভাবে না। কিন্তু না ভাবলে হবে কি ? শ্বেতী বুড়িটা তার সেই ভয়ানক মূর্তি নিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে এসে যেন দাঁড়িয়েছে। ছুরি রসিয়ে সাফ করে দিয়েছে, তবু আক্কেল হয় নি বুড়িটার। হরবিলাস চোখ রগড়াল। চেয়ে দেখে রাজারাম উঠে বসেছে।

—রাজা।

ক্লান্ত গলায় রাজা বলল, ঘুমাস নি তুই ?

—এইবার ঘুমব।

সকালবেলা হরবিলাস বলল, মেয়ে-জাতটার উপর ঘেন্না ধরে গেছে ভাই, সারারাত শ্বেতী বুড়িটা বড় জ্বালিয়েছে।

—সে আবার কে ?

—যেটাকে খুন করে ফাটক খেটে এলাম।

কাহিনীটা তা হলে বলা হয় নি বুঝি রাজারামকে। হরবিলাস বলতে যাচ্ছিল, রাজা বলল, থাক্, খুনের গল্প আর শুনতে চাই নে। ওসব শুনলে মাথায় খুন চেপে যায়। মন-মেজাজ ভালো না, জানিস তো।

হরবিলাসের মুখ বন্ধ করে দিল রাজা। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, মেয়েমানুষের উপর ঘেন্না তার হল কেন, জেনে নিলে ক্ষতি কি ? বলল, বল, শুনি।

হরবিলাস বলল, আজ থাক্, আর-একদিন শুনিস।

দিনের পর দিন চলেছে। কয়েক দিন কেটে গেল। সকালে উঠে দুজন দুদিকে বেরিয়ে যায়। মহাপাত্রের কাছে শেষবিদায় নেবার সময় দুজন যেমন রাস্তার একটা জায়গায় এসে পুবে আর পশ্চিমে ভাগ হয়ে সরে গেল, এরাও প্রত্যহ তেমনি যায়। এটা তাদের সকালের রুটিন। চওড়া রাস্তায় বেশি হাঁটে না এরা, চওড়া রাস্তায় নামে শুধু তখন যখন সে-রাস্তা হয় ভিড়ে ভরাট। হাতিবাগান থেকে গ্রে স্ট্রীট্ ধ'রে সোজা চলতে থাকে রাজারাম। সোজা চলে যায় গঙ্গার দিকে। আশপাশ দিয়ে কত লোক যায়-আসে, চকিতে তাদের মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়ে নেয়। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় না একবারও। নিজের মনে প্ল্যান করতে করতে যায় রাজারাম। তার জীবনের আগে-পিছের কথা একটুআধটু যে না ভাবে এমন নয়। কলকাতার এই উত্তর অঞ্চলেই গতিবিধি তার বাঁধা ; এই অঞ্চলটা সে তার নখদর্পণে ধরে নিয়েছে একেবারে। কোথায় কোন্ শিকারটা পাওয়া সোজা ও সহজ, তা সে জেনে নিয়েছে খুব।

রাজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ একা। ট্রাম-বাস্ হুড়হুড় করে যাতায়াত করছে। ওদিকে কাঠের গোলা। কাঠের গোলার ধার দিয়ে একা চলেছে কে ও? চেনা যেন। চেনে যেন রাজা। দেখেছে যেন কোথায়।

রাজা রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে বলল, মাফ করবেন, চেনা মনে হচ্ছে যেন?

—মনেই হচ্ছে শুধু? চেনাই যাচ্ছে না বুঝি? চোখে কুজ্ঝটিকা রচনা করে মেয়েটি বলল, এতই কি বদলে গেছি? ভালো ক'রে চেয়ে দেখ তো, চিনতে পার কি না। আমি মালা, মধুমালা।

রাজারামের দু চোখে গভীর বিস্ময়। পৃথিবীটা এমনই অদ্ভুত জায়গা। কত বছর আগের একটা দিন হঠাৎ বিনা নোটিশে এসে হাজির হল তার সম্মুখে। একটু থেমে রাজারাম জিজ্ঞাসা করল, এখানে কোথায় থাকা হয়।

—কাছেই। গঙ্গা নাইতে যাচ্ছিলাম। না গেলাম আজ। এস, আমার ঘর দেখবে এস।

রামেশ্বরের বাড়ির খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি ভঙ্গি করেই কথা বলেছিল এই মধুমালা। মহাপাত্রের মুখে এর সম্বন্ধে আবছা-আবছা কী যেন শুনেছিল, ভালো করে মনে পড়ে না আজ। যাই শুনে থাকুক, আজ একে এখানে এভাবে এত কাছে পেয়ে তার মনে হল লবঙ্গর খোঁজ এবার বুঝি পাওয়া যাবে। সেই আশাতেই হয়তো রাজারাম তার সঙ্গেসঙ্গে চলল।

কাঠের গোলা পার হয়ে ছোট একটা গলি, গলিতে ঢুকে একটু এগিয়ে ডানে একটা কানা-গলিতে ঢুকল তারা। মধুমালা তর্‌তর্ করে আগে আগে হাঁটছে, বলল, এস। এস রাজাদা!

নামটাও তা হলে মনে আছে ওর। কত আত্মীয়, কত আপনার বলে মনে হচ্ছে রাজারামের। মনে হচ্ছে, মহাদেবপুরের আঘ্রাণ সবটাই যেন মধুমালার ফুলেল তেল মাখা একরাশ চুল থেকে ভেসে আসছে রাজারামের নাকে।

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে উঠে দোতলাতেই তার ঘর। দোতলায় এই একটিই ঘর। একেবারে নিরিবিলি নিঝ ঞ্ঝাট একা থাকে মধুমালা।

—ভিতরে এস রাজাদা। কত আনন্দ হচ্ছে আমার জানো না।

আনন্দ কার না হচ্ছে? কিন্তু এত-সব কী? এত-সব শৌখিন জিনিসপত্র মালা পেল কোথা থেকে। চকচকে ঝকঝকে এত বড় একটা পালঙ্ক, দেয়াল-ভরতি আয়না, মেঝের ফরাসের উপর বড় বড় তাকেয়া, ছাদ পর্যন্ত উঁচু আয়না-বসানো আলমারি। ঘর ছোট, জিনিসপত্র তার মধ্যে যেন ঠাসা।

মালা বলল, আশ্চর্য লাগছে, তাই না? ব'সো, খবর কি বল। ছাড়া পেয়ে গেছ? ছাখো জিজ্ঞাসার ছিরি। ছাড়া না পেলে আর এখানে এলে কী করে? ওরা-সব কোথায়?

রাজা বলল, কারা? কাদের কথা বলছ?

নামটা চট্ করে বলতে পারল না মধুমালা। তার মুখে না বুকের মধ্যেই সেটা আটকে গেল যেন। বলল, কেশবকাকা, খগেনকাকা, রামেশ্বরকাকা।

রাজা জানাল, তাদের খবর সে জানে না।

—জানো না, সে কি? লবঙ্গ তোমায় অত ভালোবাসে, তার খোঁজটা নিতে হয়। তাকে কি ভুলে গেছ তুমি? হাতের চকচকে চুড়িগুলো হাতের মধ্যে পাকাতে পাকাতে সে বলল। তার কাজল-পরা চোখে কেমন করে বিদ্যুৎ যেন খেলিয়ে দিল।

মালার মনের মধ্যেও আহ্লাদের ঢেউ যেন আছাড় খাচ্ছে। এভাবে কোনোদিন রাজা তার এত কাছে এত একা এমনভাবে এসে বসবে তা সে কোনো দিন ভাবে নি। কিন্তু লোকটার চোখ-মুখের ভাব অনেক বদলে গিয়েছে বলে মনে হয়। সে বদলটা রাজার, না, মধুমালার চোখের— তা সে অবশ্য জানে না।

রাজা বলল, তুমি বড়লোক হয়ে গিয়েছ দেখছি।

ভুরু টান করে মধুমালা বলল, বড়লোকের আর দেখছ কি, ভাই। কোনো গতিকে আছি, এই আর-কি।

আলমারি খুলে হার বার করে গলায় দিয়ে বলল, নাইতে যাচ্ছিলাম, তাই খুলে রেখে গিয়েছিলাম। গয়না দেখাচ্ছি ভেবো না, গায়ে যা দেখছো তা-ই কিন্তু ভাই সব না।

তাকেয়া ঠেসান দিয়ে বসে গা মোড়ামুড়ি দিল মধুমালা। শরীর আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছে, কিন্তু চোখের চাউনিতে একটু যেন ঘুণ ধরা। রাজারাম দেখতে লাগল তাকে। গায়ের পাৎলা জামা ভেদ করে স্বাস্থ্য ফুটে বার হচ্ছে। এটাও মালার ঐশ্বর্য।

মালা শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার সৌভাগ্য। মনের মানুষ নিজে এসে ধরা দিল আজ।

জিভে জড়তা নেই, সংকোচের বালাই নেই। সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলে ফেলল মধুমালা, বলল, সবচে আগে ভালোবেসে ফেলি আমি তোমাকে। লবঙ্গ তখন তোমাকে দেখেও নি। সেই কাজ্‌রি গেয়েছিলে, মনে আছে ?

আছে। সবই মনে আছে। কিন্তু আজ সব কেমন ওলট-পালট মনে হচ্ছে। সকলের কথা জিজ্ঞেস করল মধুমালা, কিন্তু তার বাপ কৌশিকের কথা তো জিজ্ঞেস করল না একটি বারও।

রাজারাম বলল, তোমার বাবা কোথায় আছেন?

ঠোঁট উলটে মধুমালা বলল, কে জানে? আমি কোথায় আছি, সে খোঁজ নিয়েছে একবার কেউ? আমারও বয়ে গেছে তাদের খোঁজ নিতে।

সব বুঝতে পারছে রাজারাম। ঐশ্বর্যবতী মধুমালা আজ আর মহাদেবপুরের মধুমালা নয়। এখন সে নতুন রূপে নতুন রঙে নতুন নেশায় বিভোর। পূর্বজন্ম কে কোথায় মনে রাখতে পারে। ছেঁড়া কাঁথার মত যা সে ফেলে এসেছে, সে-জঞ্জাল আজ আর এ কুড়িয়ে নিতে রাজি নয়। নতুন স্রোতে সে গা ভাসিয়েছে, মজানদীর উপর তাই আর কোনো দরদ নেই মধুমালার।

রাজা উঠে দাঁড়াল, বলল, কাজ আছে। আজ যাই।

শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল মধুমালা, না। যাবে না। যেতে যদি না দিই তা হলে যাও কী করে দেখি!

—আবার আসব। রাজা তাকাল তার দিকে, তার এই দাঁড়াবার ভঙ্গিটা তার চেনা। এমনি করে একদিন সে তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল, মনে পড়ে রাজারামের।

—আসবে? কথা দাও। কথা দিলে ছেড়ে দেব আজকের মত।

রাজারাম বলল, কথা দিলাম।

—বেশ। দুপুরে এস, একা থাকি। সন্ধ্যেয় বড় হট্টগোল আরম্ভ হয়। তখন এলে ভালো করে কথা বলাই যাবে না হয়তো। কী যে আনন্দ হচ্ছে, তা কিছুতে বুঝতে পারবে না তুমি।

মুচকি হেসে রাজারাম বলল, আমি মানুষ না? বুঝতে পারব না কেন? তোমাকে আগে আমি দেখি নি? আসব, আসব।

মধুমালার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে দিল রাজারাম। এই ছোঁয়া পেয়ে

খিলখিল করে হেসে উঠল কৌশিকের মেয়ে। কাঠের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে সে বলল, এসো মাইরি।

আজ মালার ঘর বুঝি ধন্য হয়ে গেল। পথের থেকে কুড়িয়ে এনে আজ তার ঘরে বসিয়েছে সে সেই বিদেশী রাজাকে, একবার দেখেই যাকে তার চোখে লেগে গিয়েছিল। যে গাঁ ছেড়ে সে চলে এসেছে আজ পাঁচ বছর, সেই ভুলে-যাওয়া গাঁয়ের স্মৃতিটা আজ তার হঠাৎ বড় মিষ্টি লাগল। মনের কোন্‌খানটায় যেন চিম্‌টি কেটে বসে ছিল এই লোকটা, খেয়াল ছিল না তার। আজ তার মনে পড়ে গেল সব। সব কথা মনে হতে লাগল মালার।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের কোণের কাজল মুছতে লাগল সে, কাজল গেল কিন্তু কালীটা তো আর ঘষে তোলা যায় না। লবঙ্গর খবর তবে জানে না লোকটা। বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। এও মালার যেন আহ্লাদের আর একটা কারণ। আবার আসবে বলে গেছে লোকটা। মনের খিদেটা বড় বেশি করে জ্বলে উঠছে তার। মধুমালার আবার মন আছে, নিজেরই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তার। প্রেমের অভিনয় করে করে মনটা ভোঁতা হয়ে যায় নি তা হলে আজও। সে গুনগুন করে গান করছে, তার গানের কলিটা কি, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন বলছে, দিলমেঁ বহৎ খুস হামারা।

রাজারামের মনটাও যেন মাৎ হয়ে গেছে। হরবিলাসকে কথাটা বলার জন্যে সে ছটফট করতে লাগল। সারাটা রাস্তা সে গুনগুন গুনগুন করতে করতে চলল। তার কাজ-কারবারের কথা আজ আর মনে নেই তার। মস্ত কারবারই তো হয়ে গেছে তার— কৌশিকের মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে মেয়েটা

বদলে গেছে কতখানি। এই পাঁচ বছরে রাজারাম নিজেও তো বদল হয়েছে অনেকটা। দুনিয়ায় আর কে বদলালো না-বদলালো সে কথা মনে করতে এখন সে রাজি না।

নাথুবাবুর বস্তীতে এখন কাকের মিছিল দেখা দিয়েছে, চারদিক থেকে দলে দলে কাক এসে চালে বসে সভা করছে।

রাজারাম ঘরে ঢুকে দেখে হরবোলা দুটো হাতঘড়ি নিয়ে পরীক্ষা করছে। রাজারামকে দেখেই বলল, আজের সওদা।

রাজারাম তার হাতের ঘড়ি সরিয়ে দিয়ে বলল, দিলমেঁ বহুৎ খুস হামারা।

—কেন, কেন রে? ব্যাপার কি?

খাটিয়ার দড়ি ঢিল হয়ে গেছে, একটা মস্ত গর্তের মধ্যে বসার মত খাটিয়ার মধ্যে ডুবে গিয়ে রাজারাম বলল, মধুমালা।

হরবোলা উঠে এসে পাশে বসল। রাজারামের কাছ থেকে কথা-গুলো সে যেন শুনছে না, গিলছে। কিছুক্ষণ পরে বলল, ঘেন্না ধরে গেছে মেয়ে-জাতের উপর।

—না রে! তাকে দেখলে তোর রক্তও চনমন করে উঠবে।

হরবিলাস বলল, কিন্তু প্রাণটা বোধ হয় নাচবে না। তোর খুশি দেখে ভাবলাম, তোর লবঙ্গর সঙ্গে বুঝি দেখা হয়ে গেছে তোর।

রাজারাম জবাব দিল না। এ-নামটা তার কাছে যেন নতুন শোনাল। হাঁটু দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে সে বসে বসে দুলতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, যেতে বলেছে একদিন। দুপুর বেলা। রাতে নাকি ঝামেলা থাকে বেজায়।

হরবোলার গলা দিয়ে স্বর বা'র হচ্ছে নানা রকম। নানান স্বরে সে কথা বলছে। তার এত আনন্দের কারণ কি? সে তো আর নতুন

কোনো মধুমালাকে পেয়ে যায় নি। হাঁসের মত প্যাঁকপ্যাঁকে আওয়াজ করে হরবিলাস বলল, মনে পড়ছে শ্বেতী বুড়িটার কথা। ঘেন্না ধরে গেছে মেয়েমানুষের উপর।

ঘেন্নাই যদি ধরে থাকে তার জন্যে এত আহ্লাদ কিসের। ঘেন্না ধরে থাকলে নাক সিঁটকে চুপচাপ বসে থাকলেই হয়, একেবারে চুপচাপ, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে।

শিবলার ঘাটে পদ্মার ঢেউরা যেমন আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে, অমনি আছাড় খেয়ে তার মনের উপর যদি কারো ঢেউ এসে পড়ে তা হলে বুক পেতে তা নেবার আমেজ একটু আরামে উপভোগ করুক-না রাজারাম। সব মায়া সব মমতা সব টান সে তো ভুলে গেছে একেবারে। কারো কথাই তো সে মনে করে না আজকাল। এমনকি রুক্মার কথাও না— যার হাত বিছিয়ে ধরে সে বলত, এই আমাদের পঞ্জাব; যার আঙুলগুলো ধরে ধরে গুনে বলত, এই আমাদের পাঁচটা নদী। বাপ-মা-ভাই তো সাবাড় হয়ে গেছে, কিন্তু রুক্মা হয়তো জিন্দা আছে এখনো; কিন্তু কোথায় আছে তা জানার আগ্রহ পর্যন্ত সে তার মন থেকে উপড়ে ফেলেছে একেবারে। সব-কিছু বর্জন করে এখন তো সে একেবারে একা। এই খাঁখাঁ জীবনের মাঝখানে হঠাৎ যদি একটা কচি চারাগাছের মত একটা ছোট হাতছানি জেগে ওঠে, তা'তে যেটুকু খুশি হবার কথা তার চেয়ে বেশি খুশি তো সে হয় নি। সেই খুশিটা আরাম করে উপভোগ করতে চায় রাজারাম। তার দেশ ভেঙে দু আধখান হয়ে গেছে, তার বুকটাও হয়তো অমনি ভেঙে গেছে দুখান হয়ে। কিন্তু মন তো তার একখান। সেই মন নিয়ে হয়তো সে নিরিবিলি খেলা করতে চায় একটু।

হরবোলা বলল, বুরবক বনে গেছিস মনে হচ্ছে। গুম মেরে গেলি যে।

রাজারাম মুখ তুলে তাকাল না। কার দিকে সে তাকাবে? হরবিলাস তো ফতুর হয়ে গেছে একেবারে। একটা মানুষকে খুন করে সে নিজেই তো জখম করে রেখেছে নিজেকে। খুন তো করেছে একটা মেয়েমানুষকে, টাইগারের মত একটা শের-মার্কা বজ্জাতকে মারতে পারে নি।

বজ্জাত টাইগারের কথা কি ভাবে না আর কেউ? নিশ্চয় ভাবে। তিন নম্বরে বসে বসে ভাবে রামেশ্বর সুখদা আর লবঙ্গ। এখান থেকে তাদের পাত্তারি গুটাবার ডাক এসেছে, যেতে হবে অনেক দূরে। আর দু পাঁচ দশ দিনের মধ্যেই তারা জানতে পারবে, তাদের যাবার জায়গা ঠিক হয়েছে কোথায়। দেশ ভেঙে দু আধখান হয়ে গেলে বুকটাও যে ভেঙে এভাবে দুখান হয়ে যায়— একথা হয় তো বোঝে না বেশি কেউ। নতুন দেশে যাবে তারা, নতুন আশা নতুন ভরসা দিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে তারা রাজি। কিন্তু পুরনো আশা-ভরসাকে বুকের মধ্যে থেকে একেবারে উপড়ে ফেলা যায় কী করে? তিন নম্বরের ক্যাম্পে ভাঙন ধরেছে। কিন্তু এক নম্বর এখনো চাঙ্গা, তাদের ঘরের নতুন আগন্তুককে নিয়ে তারা কি ধরনের নতুন স্বপ্ন বুনছে, তিন নম্বরের তা জানা সম্ভব নয়। মাদারিপুরের পিসিমা আর আসেন না। হীরার গল্প শোনাও বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। এখানে আসার পর থেকে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা গড়বার যে উদ্যোগ প্রথমটা দেখা দিয়েছিল, সে উদ্যোগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একেবারে।

বোম্‌পাস হ্রদে সন্ধ্যা ঘনায়। উঁচু আকাশ দিয়ে উড়ে যায় পাখির ঝাঁক— দ্বিতীয়ার চিল্‌তে চাঁদের মত আধা-গোল আকৃতিতে। লবঙ্গ ঘাড় তুলে তাকায়। দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছে ওরা। তার সাধের

ময়নাটা এখন কোন্ দেশের বুনো ডালে বসে বসে তার সেখানো বুলি আওড়াচ্ছে, কে জানে।

আগে আগে হাঁটছে মানিক আর এলাচ, পিছে পিছে চলেছে লবঙ্গ। কোনো দিন তো এত ভালো লাগেনি এ জায়গা। এটা ছেড়ে যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে তত বেশি করে যেন আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে একে। ফিকে সন্ধ্যাটা নিবিড় অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, বোম্পাস হ্রদের চার ধারে লোকের ভিড় জমে উঠছে সেই সঙ্গে সঙ্গে। এই অন্ধকারের আড়াল দিয়ে হয়তো টাইগারও ঘুরে বেড়াচ্ছে জন-কয়েক। সেদিন তো একটা টাইগার তাদের ধরেছিল এখানে। এক চড় কয়ে লবঙ্গ তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকে আর একজন কার কথা যেন বেশি করে মনে পড়ে লবঙ্গর। কিন্তু তার কথা ভেবে আর লাভ নেই কিছু। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এবার তো তারা চলল।

কাঠের গোলার আশপাশে রাজারাম ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। অনেক রাত বেজেছে এখন। এখন নাকি বড় হল্লার সময়, বড় হট্টগোল নাকি আরম্ভ হয় এ সময়। ভালো করে কথা বলা নাকি এখন সম্ভব না। হল্লাটা কেমন, জানতে ইচ্ছে হয় রাজারামের। মধুমালা সেই হট্টগোলের মধ্যে বসে বসে কি করে। কেমন সাজে সাজে সে? চোখে সুর্মা দেয়, না, কাজল। দিনের আলোতে তাকে অগোছালো দেখেই বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠেছিল, সাজ-গোজে তাকে দেখলে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠবে পরখ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি?

রাজারাম এগতে লাগল। সরু গলিটায় সে ঢুকল। দিনের বেলা যে গলি ছিল ফাঁকা, এখন সেখানে লোক ধরে না। পানের দোকানে

জোরালো আলো জ্বলছে। ঝন্ করে আস্ত টাকা ফেলে দিয়ে দু'প্যাকেট সিগ্রেট কিনে নিয়ে গেল গালে রং-মাখা একটা মেয়ে। তার কানে ভেসে আসতে সস্তা হারমোনিয়ামের ক্যানকেনে আওয়াজ, সেইসঙ্গে কর্কশ গলার গান।

কানা-গলিতে পা দিয়ে রাজারাম হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়েই সে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। উপরের ঘর থেকে খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সিঁড়ির উপরে দাঁড়াল সে। দরজায় পর্দা ঝুলছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

উপরে উঠে এল সে একেবারে। পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে একটু উঁকি দিল। কার দুটো হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বসে বসে হাসছে মধুমালা। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল রাজারামের। শান্তনু লাহিড়ি।

মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠল রাজারামের। আর সে দাঁড়াল না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল নীচে। একেবারে বেরিয়ে এল রাস্তায়। হনহন করে সে হাঁটতে লাগল বড় রাস্তা ধরে। নাথুবাবুর বস্তী এখান থেকে অনেকটা দূর। এই দূর পথটা পায়ে হেঁটে চলে যেতে লাগল সে। তার তাড়া নেই কিছু, কিন্তু চলার ধরনে মনে হয় তার তাগাদার যেন শেষ নেই। রাতের কলকাতার পথ-ঘাটের বিশ্রাম নেই। ছটফট করে যাতায়াত করছে ট্রাম-বাস্। টুংটাং করে চলে যাচ্ছে একটার পর একটা রিক্শ। রাজারামের আর কোনো চিন্তাই এখন নেই, তার মাথার ঘিলু একেবারে জমাট বেঁধে গেছে বলে মনে হচ্ছে তার।

রক্তে যে ঢেউ জেগেছিল, সে ঢেউ থিতিয়ে গেল একেবারে। যে মায়াটার রেশ ছিল একটু, তাও যেন গেল মুছে। শান্তনুর উপর তত

নয়, যতটা আক্রোশ হতে লাগল তার মধুমালার উপর। দিনের বেলা যেতে বলেছে তাকে। দিনের আলোয় রূপ তার কতটা বাড়ে একদিন যেতে হবে দেখতে। একদিন যাবে রাজারাম। আজের কথাটা হরবোলাকে বলা হবে না। সেদিন সরেস কথাটা শুনেই সে গা করল না, আজকের কথা শুনলে সে তো নানান স্বরে অজস্র কথা বলে বলে অতিষ্ঠ করে তুলবে তাকে। কিন্তু এটা কি নতুন? এটা কি আশার বাইরে? মধুমালাকে আজ এভাবে দেখে তবে রাজারাম ঘা খেলো কেন? রাজারাম হয়তো তা জানে, হয়তো জানে না।

লাহিড়ি-ইস্পাহানি কোম্পানি আজ আর আছে কি না, কে বলতে পারে। দেশটা যখন দু ভাগ হয়ে গেছে, কোম্পানিও তখন ভেঙেছে দু ভাগেই। কিন্তু ওই লোকটা কেন দু-আধখানা হয়ে যায় নি আজও? মহাদেবপুরকে শুষে নিয়েছে একেবারে— ও গাঁটার বুকের মাঝখান দিয়ে স্টিম-রোলার চালিয়ে দিয়েছে ওই শান্তনু লাহিড়ি। মহাদেবপুরের লোক তবু একে ক্ষমা করেছে, এইটেই আশ্চর্য।

তিন নম্বরের ক্যাম্পের বাহান্নটি পরিবারের মধ্যে দশটা পরিবার ইতিমধ্যে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। মেদিনীপুর বাঁকুড়া আর শান্তিপুরে তারা নিজেরা নিজেরা নিজেদের আস্তানা জোগাড় করে নিয়েছে নাকি। বাকি যারা আছে তাদের যেতে হবে অনেক দূরে— আন্দামানে।

আন্দামানের নাম শুনে শিউরে উঠল সকলে। এখান থেকে জাহাজে চারদিনের পথ। বঙ্গসাগরের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ। সেখানে যাবে নিরীহ মানুষ। ওখানে নাকি পাঠানো হয় খুনেদের।

আতঙ্কের রোল উঠল তিন নম্বর ক্যাম্পে। সেখানে তারা যাবে কেন? সেখানে পাঠানো হবে কেন তাদের। বাংলাদেশটা তাদের

কি তবে বর্জন করবে পুরোপুরি, দেশের মাটি থেকে নির্বাসন দিয়ে দেওয়া হবে তাদের ? তাদের সম্মুখে সমূহ-বিপদ যে হাজির হয়েছে, এবিষয় লেশমাত্র সন্দেহ নেই তাদের। এই বিপদ থেকে তাদের রক্ষে করার লোকও নেই একটাও।

মাদারিপুরের পিসিমা এলেন ওদের বাঁচাতে। বললেন, তোমরা চোর, না, ডাকাত ; তোমরা খুনে, না, বোম্বেটে ? কেন যাবে তোমরা ? কক্‌খনো যেয়ো না। সরল মানুষ তোমরা, তাই তোমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওই সমুদ্রের জলে ফেলে দেবার মতলব।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে খবর এসেছে কারা যেতে রাজি সেখানে। প্রথমে কয়েকটা পরিবারকে পাঠানো হবে— যারা চাষী। জমি দেওয়া হবে, লাঙল দেওয়া হবে, বলদ দেওয়া হবে, মোষ দেওয়া হবে, দু মাসের জন্যে জন প্রতি বিশ পঁচিশ টাকা দেওয়া হবে। তা ছাড়া বসবাসের জন্যে ঘর-বাড়ি তোলবার মালমসলাও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

রামেশ্বর বলল, জায়গাটা কতদূর।

—দূর আছে। পাঁচ-সাত শ মাইল। বিনে ভাড়ায় জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে।

রামেশ্বর ভাবতে বসল। জমি পাবে, লাঙল পাবে, বলদ পাবে, ঘরবাড়ি পাবে। দেশটা নতুন। তারা এখন যেখানে আছে, সেটাও তো তাদের কাছে নতুনই। কিন্তু এখানে তারা আছে কত টেনে-কষে। লাঙল ধরতে না পেরে হাত তার নিশপিশ করছে। বিঘে বিঘে জমিতে আবার যদি ফসল বোনার সুযোগ পায় তো গেলে ক্ষতি কি ?

মানিক জবাব দিল না। সুখদা বলল, বুঝে দেখ। ওরা কেউ-কেউ যাবে ঠিক করেছে।

—মাদারিপুরের পিসিমা যে ভয় দেখিয়ে গেল, বলে গেল ওখানে থাকে খুনেরা।

রেশনের ডালেও কাঁকর ভরা। মেঝের ডাল ঢেলে এক-একটা করে কাঁকর বাছছিল লবঙ্গ। সে একবার মাথা তুলে তাকাল মাত্র। কিছু জবাব দিল না। ওখানে খুনেরা থাকে, পিসিমা জানলেন কী করে?

রামেশ্বর বলল, এ আর নতুন কথা কি? আন্দামানেই তো দ্বীপান্তর হয়, এ কথা জানে না কে? কিন্তু ও-জায়গাটা বাংলা তো? বাংলাদেশ ছাড়তে বড় মায়া লাগে রামেশ্বরের। এ দেশের জলকাদার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এ দেশের গ্রীষ্ম-বর্ষাকে সে জানে, এ দেশের মাটির সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। বাংলাদেশ থেকে তাদের উপড়ে নিয়ে গিয়ে অন্য কোনো দেশের মধ্যে না ফেলে যদি, তবে হয়তো রামেশ্বরও যেতে রাজি আছে।

মানিক এখন বড়-সড় হয়ে উঠেছে। তার চোখে স্বপ্ন আছে তাই বাঁধা। সেও এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি, এবার বলে উঠল, সমুদ্র দেখব। চানাচুর ফিরি করতে আর ভালো লাগে না, বাবা। বলে গেল, শুনলে না? আগে যারা যাবে, তাদেরই হবে সবচে সুবিধে। আমরা যাব আগে। ওই যে বলে গেল শুনলে না? এটাও বাংলাদেশই।

যেতেও ভয় করে, আবার মাদারিপুরের পিসিমার কথাও আর বিশ্বাস হয় না। সেবার তো তাঁরা কম্বল দেবার নাম করে কত চ্যাঁচামেচি করলেন, কিন্তু একখানাও তো জোগাড় করে আনতে পারলেন না। তাঁরা যে-দল বাঁধলেন, তার যে কি ফসল হল হীরা তো জল-জ্যান্ত দেখিয়ে দিল সেটা। আবার কোন্ মুখে তাঁর কথায় এরা নাচবে। পিসিমারা সত্যি কী চান, বোঝা যায় না। তাই বড় গোলমালে পড়ে গেল এরা।

কেউ এসে একবার এদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল না যে, খুনের দেশ সেটা নয়, খুনীদের পাঠানো হত সেখানকার জেলখানায়। সেখানে যাওয়া না গেলে পৃথিবীর কোথাও তো থাকা চলে না— জেলখানা নেই দুনিয়ার কোন্‌খানে। ঘরের কোণে বসে না থেকে নতুন অভিযানে যাবার যে দিন এসেছে ; নতুন করে ইতিহাস রচনা শুরু হয়ে গেছে ; বাংলার চাষী আজ যে সুযোগ পেয়ে গেছে, সে সুযোগ হেলায় হারাবে কেন তারা ? তাদের কাছে এই কথা সহজ আর সোজা করে বলে দিলে, তারা এত গোলমালে পড়ত না কিছুতেই। তাই এরা এখনো ভাবছে, ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে নি।

ওদিকে রাজারামও কিছু ঠিক করতে পারছে না— আবার সে যাবে কি যাবে না। হরবোলার কাছ থেকে বুদ্ধি নেবে না ভেবেছিল, কিন্তু কথায় কথায় সেদিন বলে ফেলল তাকে।

শুনে হরবোলা বলল, মেয়েমানুষের উপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলি রাজারাম। শ্বেতী বুড়িটার কথা মনে হলে এখনো গা ঘিনঘিন করে।

কিন্তু থাক্‌। খুনের গল্প শুনলে রাজারামের মাথায় আবার নাকি খুন চেপে যায়। তাই হরবোলা চুপ করে গেল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাঁড়েজি করতাল টুংটুং করে তুলসীদাস ভণতে শুরু করেন। একে একে লোক জুটতে থাকে। মটোর-মেকানিক ফিরে এসেই কালীমাখা নীল প্যাণ্ট পরেই হরিদাস কামারের কোল থেকে খোল তুলে নেয়। পায়ে তার তাপ্পি-মারা জুতো, হাতে কালী।

সেই বেশেই সে খোল নিয়ে নাচতে শুরু করে দেয়। আশপাশের সঙ্গীরা গান জুড়ে দেয় পাঁড়েজির সঙ্গে। নাথুবাবুর বস্তী দিনের বেলাটা নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল, এখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। দিনের বেলা চালে ব'সে কাক গান গায়, এখন কোকিলকণ্ঠে তুলসীদাস ভণেন পাঁড়েজি।

রং-চটা এনামেলের গেলাস বেরিয়ে পড়ে। ওদিকে ওরা গানের চেয়ে বেশি মেতেছে পানে। রাজারাম এদের সঙ্গে ছিল এতক্ষণ, এবার ওদিকে গেল।

অনেক রাতে হরবোলা তাকে টেনে এনে মেঝেয় ফেলল। খাটিয়ার গর্তের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে ফেলল না সে। সেদিনের মত মাঝরাতে আর জাগে নি রাজারাম, যখন জাগল তখন চালে চালে কাক ডাকতে শুরু করেছে।

চোখ রগড়ে উঠে বসল রাজারাম। তার দিকে চেয়ে হরবোলা হাসল, বলল, ধাঁ ধাঁ করে চলেছিস্ জাহান্নমে। যা ধাতে সয় না, তা গেলা কেন।

কেন, তার কি কৈফিয়ত সে দেবে। তার ইচ্ছে করে, তার ভালো লাগে। জীবনটা কি মরা-নদী? একই জায়গায় একভাবে শুকিয়ে ফেলে রাখতে হবে তাকে? তাজা-নদীর মত সে নিত্য নতুন স্রোত নিয়ে নতুন দিকে চলছে, তাতে ক্ষতি কোথায়। আজ সে যে-পথে চলছে, সারাটা জীবন সেই পথেই না চলতেও পারে। আগে যে-ধারায় চলত আজ তো আর সে ধারায় চলছে না। এসব লক্ষ্য করে না কেন হরবিলাস।

—তোর গল্পটা আজ শুনব।

—কোন্‌টা?

—সেই বুড়িটার।

হরবিলাস বলল, শখ জেগেছে বুঝি? খুনের গল্প শুনলে নাকি মাথায় খুন চেপে যায়?

রাজারাম বলল, যায়ই তো।

হরবিলাস বলল, মেজাজ সরিফ আছে তো? এখনো তো ঝিমচ্ছিস বসে বসে।

কাশী। বেনারস। মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে দু কদম দূরে তিন-তলা বাড়ি আছে একটা। বাড়িটার নাম তার গায়ে লেখা আছে শ্বেত-পাথরের উপর কালো শিশে দিয়ে— শ্বেতসাগর। মস্ত বাড়ি। কিন্তু তার কোনো বাসিন্দে নেই, অন্নদা ছাড়া। তার বয়স হবে চল্লিশ কি পঞ্চাশ। খুব ভারিসারি, খুব মেজাজী। তার সারা গায়ে শ্বেতী। মুখ ভরতি শ্বেতী। সারা মুখ বিলকুল যদি সাদা হয়ে যেত তা হলে অত ভীষণ দেখাতো না তাকে। এত বড় একখানা মুখ। সেই মুখে কালো কালো চক্কর ভরা। কালো চক্কর গুলোই তার নিজের চামড়ার রং, বাকিটা রোগের। বিশ বছর আগে সে বিধবা হয়। ছেলেপুলে নেই। তাই সাজগোজের ঘটা আছে খুব। শ্বেতসাগরের কুকুরটা ছিল খুব নাম-করা, খুব ডাগড়া। অন্নদার পোষা কুকুর সেটা। গলায় শিকলি বেঁধে অন্নদা রোজ সকালে আর সন্ধ্যেয় বেরিয়ে বেড়াত গঙ্গার কিনারে। এখানে নোকরিতে বহাল হল হরবিলাস। সে তো অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। চোদ্দ বছর তো সে কাটিয়ে এল জেলেই। আর দু-তিন বছর পরে আপনিই খালাস হয়ে যেত সে। বিশ বছরের কয়েদ, ছুটিছাটা বাদ দিয়ে ষোল-সতেরো বছরেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ওই ভয়ংকর চেহারাটার দিকে তাকাতেই ভয় করত হরবিলাসের— প্রথম প্রথম। তার পর স'য়ে

যায়। চটপট বলে যাচ্ছে হরবিলাস। পুরনো কথাটা ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার তার ইচ্ছে নেই। ওই কুকুরটা ছিল অন্নদার প্রাণ। ওর গলা জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে বসে খেত। বড় ঘেন্না করত হরবিলাসের। রাতে অন্নদার ঘরে শুয়ে থাকত সে। কুকুরের নাম ছিল একটা—বোধ হয় টাইগার। নাম শুনে চমকাবার কিছু নেই। হরবিলাস রাজারামের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল। কুকুরের এমন নাম হয়। কিছুদিন বাদে কোথা থেকে এক ছোকরা এল সেখানে, তার নামটা স্পষ্ট মনে আছে হরবিলাসের— উৎপল। রাজপুত্তুরের মত চেহারা। অন্নদা বলত, এ তার ছেলে; একে সে পালবে, মানুষ করবে, তার পর এই ঘরবাড়ি সব একে দিয়ে যাবে। তার নিজের ছেলেপুলে নেই আগেই বলেছে হরবিলাস। বাড়ির নতুন মালিককে তাই খুব সমীহ করতে হত। তার ফুটফরমাশটা খাটতে হত। বুড়িটা চরকির মত ঘোরাত নোকরদের। সারাদিন উৎপলকে ছায়ার মত ঘিরে থাকত। কিছুদিন বাদে মনে হল, ছেলেটা যেন ভড়কে গেছে, তার চোখমুখ শুকিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু অন্নদা তেতলার বারান্দায় বসে বসে তাকে তোয়াজ করত আর কী-সব বোঝাত। এক ঘরে থাকত তিনটি প্রাণী— অন্নদা উৎপল আর টাইগার। মাঝরাতে চারদিক যখন চুপচাপ, তখন নীচতলা থেকে হরবিলাসরা শুনতে পেত কুকুরটা ঘেউঘেউ করে ডাকছে এক লাগাড়ে। কুকুরটা অমন ডাকে কেন! আগে তো এমন ঘেউঘেউ এ করত না। সন্ধ্যে গড়াবার পর একটু যদি এদিক-ওদিক যেত হরবিলাসরা, ডেকে যদি সাড়া না পেত অন্নদা, তা হলে যা-তা গাল পাড়ত। বলত, সাঁঝ হতেই এদিক-ওদিক যাওয়া কেন, ওসব বদ অভ্যেস থাকা নাকি চলবে না তার নোকরদের। কোন্ অভ্যেসটার কথা বুড়ি বলত, তা আন্দাজ করতে পারত হরবিলাস। কিন্তু রাজারামের

গা ছুঁয়ে সে বলছে, আদপে ওসব দিকে টান তার ছিল না। একদিন মাঝরাতে কুকুরটা ভীষণ ডাক শুরু করে দিল। ছেকল যেন ছিঁড়ে যায়। তরতর করে উপরে উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতল হরবিলাস। ইশ, সারা গা শির-শির করে উঠল তার। এসব কী শুনছে সে? ভাবতেই যে পারা যায় না। সকাল হলে ছেলে ডাকে, মা। মা বলেন, কি বাছা উৎপল। রাগটা গিয়ে পড়ল উৎপলের উপর, ওটাকে সরাতে হবে। এইভাবে দিন যায়। সেদিন দুপুরবেলা, টাইগার দোতলায় বাঁধা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হরবিলাস উপরে গিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বেরিয়ে এল ঘেন্নায়। এ যেন দিন-দুপুরে ডাকাতি। হঠাৎ খুন চেপে গেল তার মাথায়, সে ছুটে গিয়ে কাটারি এনে এক কোপ বসিয়ে দিল চোখ বুজে। পরে শুনেছে শ্বেতী বুড়িটা শেষ হয়েছে। ঠিক জায়গায় কোপ লেগেছিল তা হলে।

হরবিলাস থামল, একটু পরে বলল, সাজা হল আমার। ওই বুড়িটার শাস্তি হল না কিছু। শালী মরে বেঁচে গেল। জবাই করাটাই পাপ। জবাই করলাম কেন তার হিসেব নিল না কেউ।

রাজারামের চোখের সামনে ভাসতে লাগল ছবিটা, বীভৎস শ্বেতী বুড়িটার। কি যেন চিন্তা করে সে বলল, আদালতে এসব কথা বললি নে কেন?

—বলব কি? খুনীর কথা কেউ গ্রাহ্য করে। ঠুকে দিল বিশ বছর।

—তোর কেউ নেই, হরবিলাস?

—কে জানে! কে আছে না-আছে। কতদিনের কথা, আমার জন্যে কারো বসে থাকতে বয়ে গেছে।

ক-দিন থেকে কাজ-কারবার একেবারে বন্ধ। এক কানাকড়ি আমদানি হচ্ছে না। ঘড়ি দুটো বেচে দিয়ে ষাটটা টাকা নিয়ে এসেছে হরবিলাস।

হরবিলাস বলল, আমার আর কি। আগে ছিলেম নোকর, খেটে খেতাম। জেল খেটে ব'নে গেলাম পকেটমার।

রাজারাম বসে বসে ভাবছে কি-যেন। গোরু আর মোষ নিয়ে তার জীবন ভালোই কাটছিল তার দেশে— স্থচেতপুরে। সেই রাজা হয়ে গেল ঠিকাদারের নোকর, মজদুরের পাণ্ডা। জেলে একটা পাক খেয়ে এসে আজ সেও হয়ে গেছে পকেটমার। অনেক রকম জীবন সে চেখে দেখল। এর মধ্যের প্রথমটার স্বাদই তার মনে লেগে আছে। এখন যদি পেয়ে যায় একটা খাটালে বা বাথানে একটা কাজ, তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে রাজি। হরিণঘাটায় মস্ত গোশালা হয়েছে— কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছে সে ক-দিন আগে। রামেশ্বরদের খোঁজে যখন গিয়েছিল সেখানে। একটা ঝুটা খুনের দায়ে সে খুনী হয়ে দাঁড়াল শেষটায়, এ তার কম আক্ষেপ নয়। গায়ের এ দাগটা মুছে ফেলা যায় কী করে।

নাথুবাবুর বস্তীতে দিন যায়, রাত আসে। তিন নম্বরেও দিন রাত যাচ্ছে আসছে। কিন্তু এই দিন-রাতেদের সঙ্গে এর ওর কোনো সাক্ষাৎ নেই। এখানকার চালে ব'সে যখন হল্লা করে কাকের দল, তিন নম্বরের ঘরের ভিতর তখন কিচমিচ করে চড়াই।

অন্নদার মূর্তিটা রাজার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘেন্না করারই কথা বটে। রাজারাম চোখে দেখে নি, তবুও একটু ভাবতে গেলে গা শিরশির করে ওঠে।

হরবিলাস বলল, একটা মোটা দাঁও না মারলে চলবে না রাজা। ছ্যাচড়ামি ভালো লাগে না। একটা মক্কেল ধর ভালো দেখে।

মুখ বুজে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সে এ-প্রস্তাবে সায় দিল। তার পর বেরিয়ে গেল একা। তার যাবার ধরন দেখে মনে হল মস্ত মক্কেল বুঝি সত্যিই সে পাকড়েছে।

হাতিবাগানের মোড়ে এসে সে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। লোকজন যাতায়াত করছে, ট্রাম-বাস্ যাচ্ছে আসছে। রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল রাজারাম। হাতটা তার নিশপিশ করছে। গ্রে-স্ট্রীটের মোড়ে ভিড় জমেছে দেখে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে একটা লোকের পা মাড়িয়ে দিয়েই তার পকেটে হাত পুরে দিল রাজারাম। লোকটা লাফ দিয়ে উঠে পা সরিয়ে নিয়েই খপ করে চেপে ধরল রাজারামের হাত।

রাজারাম মুচকে হেসে বলল, চিনতে পারেন?

লোকটা মারমুখো হয়ে রুখে দাড়াতেই রাজারাম বলল, গোয়ালন্দের ষ্টিমারে দেখা, মনে নেই?

তারপাশার নিকুঞ্জ সাহা। নিকুঞ্জ সাহা তাকে চিনল না, বলল, 'পকেটে হাত দিলে কেন?

বুক তার কাঁপছে, কিন্তু মুখে প্রসন্ন হাসি হেসে রাজারাম বলল, পকেটে হাত তো দিই নি। ভুল করছেন। চেনা আদমি দেখলাম, তাই। মনে নেই শিবলায় নেমে গেলাম আমি।

এতক্ষণে নিকুঞ্জ যেন চিনল। কিন্তু তাকে পাত্তা দিল না। ষ্টিমারে দেখার পর থেকে এর উপর ধারণা তার ভালো না। লোকজন জুটে গিয়েছিল, এদের দু জনকে কথা বলতে দেখে তারা যে-যার চলে গেল।

রাজারাম কি-যেন বলতে যাচ্ছিল তাকে, কিন্তু নিকুঞ্জ কান করল না। ঘাড় ফিরিয়ে চলে গেল সটান।

খুব বাঁচা বেঁচেছে আজ রাজারাম। আজ আর যাবে না কোথাও। মধুমালার ওখানে যাবে বলে ঠিক করেছিল সে, তার কথা ভেবেই ঘর থেকে বার হয়েছিল, কিন্তু মস্ত বাধা পড়ে গেল। রাজারাম তাই ফিরে এল ডেরায়।

হরবিলাস বলল, এত শিগগির? কিছু আনলি নাকি? মুখ বুজে যেমন বেরিয়ে গেলি মেজাজের মাথায়, মনে হল লাখ টাকা নিয়ে আসবি বুঝি।

রাজারাম খাটিয়ায় ডুবে বসে বলল, খুব বাঁচোয়া। ধরা আজ পড়েছিলাম প্রায়।

হরবিলাস উঠে এসে পাশে বসল, বলল, কি রকম।

রাজারাম বৃত্তান্তটা বলল, ভাগ্যিস মুখটা দেখা ছিল আগে, আর চট্ করে মনে পড়ে গেল মুখটা। পকেট কিন্তু খুব ভারি ছিল ওর। জুটলে মোটা রকমই জুটত।

মটোর-মেকানিক কাজে বেরচ্ছে। উঁকি দিয়ে বলল, দুই দোস্তে কি প্ল্যান আঁটছ বসে বসে, কাজে বেরুবে না?

—এই, এবার যাব। বেলা হয়ে গেছে বুঝি অনেক?

—তা, দশটা বাজে।

মেকানিক তাপ্পি-মারা জুতোয় খটমট শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

হরবিলাস বলল, বরাত তোর ফিরেছে। হোঁচট না খেলে চলায় আরাম কি রে। চলছি যে, সেটা তো মালুম হওয়া চাই। এবার তোর ভালো কারবার হবে মনে হচ্ছে।

মনে তো হচ্ছে রাজারামেরও। সেই কথা ভেবেই তো ভারিক্কে চালে মাথা ঝাঁকি দিতে দিতে সে বেরিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে খুচরো লোভ করতে গিয়েই তো তাকে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসতে হল।

সেদিন সারাটা দিন মধুমালার কথা বসে বসে ভাবল রাজারাম। শান্তনু লাহিড়ির কথাটাও তার মনে হতে লাগল। একা মধুমালার কথা তো ভাবাই যায় না। তার কথা ভাবতে গেলেই শান্তনু এসে হাজির হয় সামনে। কৌশিকরা কোথায় তা জানেও না মধুমালা। আরো

আশ্চর্য, তার কথা জানারও কোনো আগ্রহ নেই তাদের। দুনিয়াটা বড় আজব জায়গা বলে ঠেকে রাজারামের। হরবোলার শেতী বুড়িটার কথাও মনের মধ্যে নড়ে-চড়ে ওঠে। শক্ত হয়ে বসে রাজারাম। মধুমালার হাল ফিরে গেছে একেবারে। ধরাকে সে সরাই জ্ঞান করে বুঝি এখন। কিন্তু যা-ই হোক, তার হাল-চাল দেখে মনে হল, খুব টান আছে তার রাজার উপর। টানটা একবার পরখ করে নিলেই-বা ক্ষতি কি। কিন্তু ঘেন্না করে যে, সেদিন শান্তনুর হাত-দুটো যেমন ভাবে ধরে বসে ছিল, তাতে রাজার মন মুষড়ে গেছে একেবারে।

সন্ধ্যায় খোল-করতাল বেজে উঠল, কিন্তু রাজারাম উঠল না। অদূরে বসে বসে তামাশা দেখছে হরবিলাস। কোনো কথা বলছে না। আজ একটা হোঁচট খেয়েই রাজা একেবারে ভড়কে গেল। এমন মানুষ নিয়ে এসব কারবারে নামাই মুশকিল।

ওদিকে আসর জমে উঠল। তবু রাজারাম নড়ল না। কেউ ডাকলও না তাকে। এখানে হাঁকডাকের নিয়ম অবশ্য নেই। যার প্রাণে ফুর্তি আছে, সে আপনি এসে ভিড়ে পড়ে। যে চায় না সে থাকে তফাতে।

হরবিলাস বলল, শরীর চাঙ্গা নেই নাকি রে? না, প্যাঁচ আঁটছিলি বসে বসে। চুপচাপ যে বড়।

—প্যাঁচ আঁটছি।

রাতেও প্যাঁচ এঁটেছে সে। সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, তা জানার দরকার অবশ্য নেই। কিন্তু কাছে-ভিতে তার থাকা দরকার। দরকার হলে নতুন সওদা-টওদা হাত-বদল তো করে দিতে হবে।

রাজারাম সকাল বেলাটা এদিক-ওদিক ঘুরে কাটিয়ে দিল। ঘুরতে

ঘুরতে সে এসে গেল ইডেন-গার্ডেনে। বাগানটা পার হয়ে গঙ্গার কিনারে এসে দাঁড়াল রাজারাম। জাহাজের চোঙ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বার হচ্ছে। হরবিলাসের সঙ্গে এখানে একদিন কাটিয়ে গেছে সে অনেকক্ষণ। কিন্তু তখন ছিল রাত। দিনের আলোয় সে চেয়ে চেয়ে দেখছে গঙ্গা। পারে ছোট ছোট নৌকো অনবরত দোল খাচ্ছে। মাঝিরা উনুনে ভাত রাঁধছে। কত সংক্ষেপের সংসার এদের। একটা কাঠের নৌকো, সেইটেই ঘর-বাড়ি রসুইখানা কাজ-কারবারের জায়গা।

হাঁটতে হাঁটতে আউটরাম-ঘাট থেকে সে চলে গেল চাঁদপালে। ফেরী ইষ্টিমার এসে লাগল ঘাটে। শিবলায় যেন লোক নামছে। হঠাৎ একটা চেনা মুখ যদি নেমে পড়ে এখান থেকে। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল রাজারাম। পদ্মা-মেঘনা, বিপাশা-চন্দ্রভাগা— সব তলিয়ে গেছে কোথায়। আজ সব উধাও হয়ে একটি মাত্র গঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে তার সম্মুখে।

রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। কপালে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে সূর্যের দিকে তাকাল সে একটি বার। তার পর আবার ফিরে এল আউটরামে। সেখান থেকে সে ট্রাম নিল একটা নিমতলার।

কাঠের গোলার গা দিয়ে ট্রাম যেতেই সে উঠে পড়ল। ধীরে-সুস্থে নামল অনেকটা এগিয়ে গিয়ে।

বেলা অনেক হয়েছে। সারা পাড়া দুপুরের ঘুম ঘুমচ্ছে বুঝি এখন। রাজারাম কাঠের গোলা পেরিয়ে সরু গলিতে ঢুকল, তার পর কানা-গলিতে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু সন্তর্পণেই উঠল। উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েই একেবারে চোখাচোখি মধুমালার সঙ্গে। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুমকুমের টিপ পড়ছিল সে কপালে। আয়নায় ছায়া

দেখল রাজারামের। কুম্‌কুমের শিশি রেখে দরজার কাছ-বরাবর এসে বলল, বাব্বা, এত দেমাক। ভেবেছিলাম, পরদিনই আসবে। ক'দিন কেটে গেল বল তো। ভাবলাম, বুঝি ভুলেই গেলে, বুঝি ঘেন্না করেই এলে না আর।

আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে মধুমালাকে। রাজারাম তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে বার বার, কথা বলছে না একটাও।

—অমন করে তাকাচ্ছ যে? খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি আমাকে। তোমার লবঙ্গর চেয়ে দেখতে অনেক ভালো। ঠিক কিনা!

রাজারাম বলল, আমার লবঙ্গ মানে?

—থুড়ি। বলতে নেই। ও একটা কথার কথা। নতুন লোক এসেছে ঘরে, একটা-কিছু বলে আলাপ তো জমাতে হবে! তাই আর-কি?

আলুথালু হয়ে বসল মধুমালা, দেহটা একেবারে যেন বিছিয়ে দিল সে। তার দাঁড়াবার আর বসবার ভঙ্গিই অবশ্য এই।

—অত দূরে দূরে কেন, সরে এসে বসো। বিয়ের নতুন কনের মত করছ যে। দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। বর এসেছে ঘরে, আহ্লাদ হবে না আমার?

মধুমালা শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল। রাজারামের গা ঘেঁষে বসে বলল, এখন আমরা একদম একা। কেউ জানতে পারবে না কিছু। এবার চাও মুখের দিকে।

রাজারাম সারাটা ঘরে চোখ বুলাল। নতুন রেডিয়ো এসেছে আবার। নতুনই এসেছে মনে হচ্ছে, একেবারে টাটকা দেখতে, সেদিনও তো চোখে পড়ে নি তার।

রাজারামের হাত ধরেছিল মধুমালা। আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে রাজারাম বলল, কার সঙ্গে এখানে এলে তুমি?

—আসবার যদি মন হয়, তবে কি লোকের অভাব পড়ে? যদি বলি, একলা এলাম।

—তা হয় না।

—তবেই ধরে নাও, কেউ একজন ছিল সঙ্গে।

রাজারাম তার হাঁটুর উপর হাত রেখে বলল, তার নামটা শোনার ইচ্ছে হচ্ছে।

—চিনবে না তাকে। ও কি, অমন করছ কেন? চিম্‌টি কেটো না ভাই, সুড়সুড়ি লাগে। তাকে তুমি চিনবে না।

রাজারাম হাসল, হেসে বলল, নাম বাৎলাতে ভয় কি? চিনতেও তো পারি।

মধুমালা বলতে রাজি নয়। রাজারাম বলল, আমি জানি। শান্তনু লাহিড়ি।

চমকে গেল মধুমালা। বলল, হঠাৎ ও নামটা মনে এল যে।

আর কোনো কথা নয়। মধুমালা বার বার তাকাতে লাগল রাজারামের দিকে। লোকটা যেন পাথরের মত অটল হয়ে বসে আছে। চোখ-দুটো তার স্থির।

—রাগ করলে, ভাই? বলছি, ঠিকই ধরেছ। কিন্তু কাউকে যেন ব'লো না। ওসব কথা বলতে নেই।

রাজারাম নড়ে বসল, বলল, বলব না, ভয় নেই। শোনার ইচ্ছে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। এত জিনিসপত্তর, সব বুঝি শান্তনুর?

—ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। আমাদের পেট ভরাতে কি একজন লোকের সাধ্যি আছে? বোঝ না কেন। ভালোবেসে যে যা দেয়, তাই লাভ।

রাজারাম একটু সরে বসল। একটু আলগা হয়ে বসে বলল, তোমার ঘরে কুকুর নেই?

মুচকে হাসল মধুমালা, বলল, ব্যায়ড়া প্রশ্ন যত। কুকুর দিয়ে করব কি? ওসব বড়োয়ানি শখ নেই, বাপু। টেনে-কষে চলে যাচ্ছে দিন, চলে যাক। এক-একবার ইচ্ছে করে— পালাই। আর ভালো লাগে না। কোনো মনের মানুষ যদি নিয়ে যায় সঙ্গে করে, চলে যাই।

রাজারাম নিশ্বাস ফেলল। মনের মানুষ একবার নিয়ে এসেছে সঙ্গে ক'রে, আবার কোনো মনের মানুষ পেলে আবার এ চলে যেতে রাজি। কোথায়, সে কোন্ দেশে, তা জানে না মধুমালা। তার মনটা শুধু নাকি পালাই-পালাই করে। লবঙ্গর সঙ্গে সেই কুয়োতলার গল্প থেকে শুরু করে সব কথাই টাটকা মনে আছে মধুমালার। টান তার হয়েছিল এই লোকটার উপর। কিন্তু সে লোকটা তো এখন নেই, এখন তার সমুখে বসে আছে যেন একেবারে আলাদা এক আদ্‌মি। একেবারে যেন অচেনা, একেবারে আন্‌কোরা। এমন আনাড়ি লোককে কী করে কাবু করতে হয়, তা অজানা তার নয়। তাকেয়ার উপর গা এলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে মধুমালা বলল, আমার কেউ নেই।

বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল রাজারাম, কি যেন বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। মেয়েটার দিকে সে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না কিছুতে। এইখানেই যেন আপত্তি মধুমালার। সোজা হয়ে বসে সে বলল, বলি, ভাবা হচ্ছে কা'র কথা? একবার এদিকে তাকালে চোখ ক্ষ'য়ে যাবে বুঝি?

রাজারাম তাকাল তার দিকে, বলল, কারো কথাই আর ভাবি নে।

গলার স্বরটা এত ধরা-ধরা কেন? মধুমালা বলল, ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি? গলা ঘড়ঘড় করে কেন! জামাটা খুলে পা উঠিয়ে একটু ভালো

হয়ে ব'সো। বসার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র উঠে যাবে। প্রাণ খুলে তাই কথাই আরম্ভ করতে পারছি নে।

রাজারাম বলে ফেলল, হঠাৎ যদি শান্তনু এসে পড়ে।

—দিন-দুপুরে সে অত আসে না। বলেই মধুমালা বলল, সে আসবে জানো কি ক'রে ?

—আন্দাজ। আন্দাজ। বিকট শব্দে হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল রাজারাম। এমন হাসি, মধুমালা কেন, কেউই তো হাসতে শোনে নি আগে।

মধুমালার খটকা লাগল, বলল, মন বোধ হয় ভালো নেই। আজ যাও। আর-একদিন এস। কি, কথা কও না যে।

মহাদেবপুরের প্রেতের সঙ্গে যেন কথা বলছে রাজারাম। বীভৎস উল্লাস নিয়ে সেই গাঁয়ের কঙ্কাল যেন আজ তার সম্মুখে এসে হাজির হয়েছে। সেই ভয়ংকর মহাদেবপুরটা, সেই নির্জন শিবমন্দির, নিঃসঙ্গ মহাপাত্র, অন্নহীন সেই অগণ্য মানুষের আর্তনাদ একসঙ্গে মনে পড়ে গেল রাজারামের। যা ছিল তার মনের অতলে তলিয়ে, খোঁচা খেয়ে তা-ই যেন বুদ্বুদ হয়ে ভেসে উঠতে লাগল উপরে। মণিলালের সেই অসহায় মূর্তিটা এসে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। ক্যাণ্টনমেণ্টের আবছা আলোয় দেখা তার বাপের মুখটা মনে পড়ে গেল তার। একসঙ্গে চারদিক থেকে ছেকে এসে ধরল তাকে অশরীরী কতকগুলো ছায়া। তারই মাঝে একটা নিদারুণ বিদ্রূপের মত একমাত্র মধুমালা তার সামনে প্রলোভনের মূর্তি ধ'রে বসে আছে। চোখে তার বিদ্যুৎ, সারা শরীরে রোমাঞ্চ।

রাজারাম বলল, আমি যাব না।

—বেশ তো। মধুমালা বলল, একটু জিরিয়ে-জুড়িয়ে নাও। মনটা

ভালো নেই বুঝতে পারছি। কী যেন হয়েছে তোমার। আমাদের দেশে আর গিয়েছিলে?

আর কোনো কথা নয়। রাজারাম একটু বসে থেকে আবার উঠে দাঁড়াল। না, চলে যাওয়াই ভালো। কৌশিকের মেয়ের ভালোবাসায় সত্যি যদি আটক পড়ে যায় সে। শান্তনুকে যে কাবু করেছে, শান্তনুর একটা ক্ষুদে কর্মচারীকে সে ঘায়েল করবে, এ আর বেশি কি? মনের মানুষ পেলে ও কোথাও চলে যেতে রাজি। এটা কি ওর কথার কথা! কথার কথা বলে মনে হল না রাজারামের, যেমন দরদ দিয়ে কথাটা ও বলল, তাতে যেন মনে হল সত্যিই রাজারামের উপর খুব টান তার আছে।

টান নেই, এমন কথা তো বলে না মধুমালা। টান তার আছে, সেই আনকোরা জীবনের প্রথম ইচ্ছেটা চাপা প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু তা মরে গেছে কে বলল।

রাজারাম বলল, মনের মানুষ পেলে কোথাও চলে যাও, তাই না।

একটু থেমে মধুমালা বলল, যাইই তো। নিয়ে যাবার ইচ্ছে বুঝি?

মধুমালার হাতটা ধ'রে ফেলল রাজারাম। মেয়েমানুষের হাত বুঝি এমনি নরম। রাজরাম তাকে টেনে নিল কাছে, বলল, যাবে?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে?

মধুমালা ভয়ের চোখে তাকাল তার দিকে, বলল, কদ্দূর?

কত দূর? তা কী করে বলতে পারা যায় হঠাৎ। রাজারাম ক্রমেই তাকে টানতে লাগল কাছে, ক্রমেই তাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল নিবিড় করে। মধুমালা গা এলিয়ে দিয়ে বলল, যেতাম। কিন্তু এত জিনিসপত্তর। এগুলো—

—ফেলে দাও। জ্বেলে দাও। চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলল রাজারাম। দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, ঘরে কুকুর নেই। বাঁচোয়া।

দম আটকে আসছিল মধুমালার, মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল বৃথাই।

রাজারাম নিজেকে উদ্দেশ ক'রেই যেন বলল, শান্তনু লাহিড়ি এসে যেন দেখে যায়।

কথাটা যেন সে মধুমালার কানে-কানে বলল। তার পর স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত দৃষ্টিতে একবার তাকাল নিঃসাড় ঐ দেহটার দিকে। নিজের মনেই হাসল, তার পর পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল মধুমালার ঘর থেকে।

সারাদিন নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে জানে। গভীর রাত্রে রাজারাম ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। হরবোলা তার অপেক্ষাতে বসে আছে অনেকক্ষণ থেকে। রাজারাম আসতেই সে উঠে বসল। অন্ধকারের মধ্যে থেকেই বলল, কি রে, খবর কি? এত রাত করলি।

হরবোলার হাতের মধ্যে ধুপ ক'রে কি-যেন ফেলে দিলে রাজারাম! বেশ ওজন আছে, বেশ ভারি। ফিস্‌ফিস্ করে হরবোলা বলল, সোনাদানা নাকি রে?

রাজারাম তার মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ।

চুপ তো চুপ। সারা রাত চুপচাপ কাটিয়ে দিল দু'জন। মোটা দাঁও কোনোখান থেকে যে মেরে এনেছে, এটা বুঝল হরবোলা। অন্ধকারের মধ্যেই মনটা তার নাচছে। কিন্তু এই মাল নিয়ে এভাবে বসে থাকা হয়তো ঠিক না। হরবোলা উঠে গেল পা টিপে-টিপে।

রাস্তার আলো ছিটকে এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই আলোতে সে হাতের সওদা এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার ফিরে এল ঘরে। উপুড় হয়ে রাজারামের কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে বলল, মেলা যে রে। কা'কে সাবাড় করলি।

রাজারাম হাত বাড়িয়ে হরবোলার মুখটা চেপে ধরল। একটা কথা নিজে বলছে না, একটা কথা হরবোলাকেও বলতে দিতে চায় না।

এখানে আর না। এই মহানগরের মায়া কেটে গেছে তার। এখান থেকে এবার সে চলে যাবে কোথাও। কদ্দূর? কত দূর তা কী করে বলতে পারা যায় হঠাৎ। ডাঙার মায়াও তার যেন ফুরিয়েছে, এবার সে জলে নামবে। গঙ্গার নৌকাগুলো দেখে এসেছে সেদিন, সে-জীবনটা আরামের কি না, কী করে বলতে পারা যায়। কিন্তু ওই জীবনটা তার ভালো লেগেছে। হরবোলার মত গলা তার নেই, কিন্তু পলকে পলকে পালটে ফেলা যায় এমন একটা রূপ যদি তার থাকত, যদি সে হতে পারত বহুরূপী।

সকালে হরবোলা তাকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল, রাজারাম বলল ফিরে এসে বলবে। এই কথা ব'লে সে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় মনে-মনে সে নাথুবাবুর বস্তীর কাছে বিদায় নিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

যে-যে রাস্তায় ভিড় আর লোকজনের চলাচল বেশি সেইসব রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে চলল। লোকের চোখের আড়ালে থাকার পক্ষে ভিড়ের মধ্যে থাকাই নাকি সবচেয়ে বেশি সুবিধে।

এই মহানগরীতে পৌঁছে প্রথম হরবোলা আর সে যেখানে বসে ঝাল-চানা চিবিয়েছিল, সেইখানে এসে পৌঁছতে তার দুপুর বেজে গেল।

ওদিকে জাহাজের চোঙ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, এদিকে কালো চক্‌চকে

পিচের রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে নানা ধরনের ঝকৃঝকে গাড়ি। কিছু তো একটা করতে হয়, খালি-হাতে বসে থাকা ঠিক না। এদিকে আসার সময় তাই সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে জুতোপালিশের সরঞ্জাম। কাঠের ছোট একটা ফ্রেম, কালো লাল আর গোলাপী কালীর কৌটো, আর তার সঙ্গে কয়েকটা বুরুশ। রাজারাম মাতোয়ারা হয়ে জুতো বার্নিশ করছে বসে বসে। এই ঘাঁটিটা তার যেন মনের মতই হয়েছে। কাজটাও ভালো লাগছে তার। এতে কারো মুখের দিকে তাকাতে হয় না, মাথা নীচু ক'রে আরামে কাজ করা চলে।

সন্ধ্যের পর হাতের মালপত্তর নিয়ে সে সটান চলে যায় চাঁদপালঘাট পেরিয়ে লালদিঘিতে। লালদিঘির পুব দিকে বড় বড় বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে কাতারে কাতারে লোক রাত কাটায়, টান টান হয়ে শুয়ে লম্বা ঘুম লাগায় রাজারামও।

হরবোলার সঙ্গে আর সে দেখা করতে গেল না, আর সে যেতে চায় না ও-পথে। এবার সে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাবে কোথাও।

পরদিন আবার সে গেল চাঁদপালে, সেখান থেকে আউটরামে। লোকের খুব ভিড়। খদ্দের জুটছে ভালো। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় বাইশ জোড়া জুতো পালিশ ক'রে ফেলল রাজারাম। জাহাজ-ঘাটের কাছেই জমাট হয়ে আসর জমিয়ে বসেছে সে। গ্যাংওয়ে লোকময়। সার বেঁধে কত লোক গ্যাংওয়ে দিয়ে সটান ফ্ল্যাট ডিঙিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে জাহাজে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ভিড়ের দিকে এক-একবার তাকাচ্ছে রাজারাম। ছেলে-জোয়ান-বুড়ো-বাচ্চা-কাচ্চা— এত লোক দল বেঁধে চলল কোথায়।

উঠে দাঁড়াল রাজারাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল মানুষের এই মিছিল। মানুষের একটা স্রোত বয়ে চলেছে যেন।

ওদিকে গঙ্গার স্রোতের উপর ঢেউয়ের ধাক্কায় ছোট ছোট নৌকো দোল খাচ্ছে। রাজারামের মনেও যেন হঠাৎ লেগে গেল ঢেউয়ের ধাক্কা, তার মনও দুলে উঠল অমনি। সেও যদি ওই স্রোতের তোড়ে একটা খড়কুটোর মত চলে যেতে পারত কোথাও। এই মহানগরের এই পথঘাট বাড়িঘর জনমানুষ, এর মধ্যে তার যেন হাঁফ ধরে। আর তার থাকতে ইচ্ছে করে না এখানে। তার পৃথিবীর দুটি প্রান্ত যেন মিলিয়ে গেছে শূন্যে। তার জীবন থেকে উহ্য হয়ে গেছে যেন তার পৃথিবীর পুব আর পশ্চিম। কোন্ প্রান্ত দিয়ে হবে তার জীবনের সূর্যোদয় আর কোন্ দিকেই-বা হবে তার অস্ত— কিছুই আর ভেবে পায় না রাজারাম। তা হলে এমন জীবন যাপনের মানে কি। যে জীবনের মানে নেই, সেই জীবনের নতুন কোনো অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না— এই বুঝি তার চিন্তা।

পর পর এগিয়ে চলেছে কত লোক। ওরা নাকি চলেছে এক নতুন দেশে নতুন করে জীবন শুরু করতে। ওদের চোখ-মুখের ভাবটা তাই দেখার জন্যে উৎসুক হল রাজারাম। তার জীবনও তো এখন একটা হালভাঙা নৌকোরই মত, মাঝসাগরে দিক ভুলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেবলই আছাড় খাচ্ছে। নতুন বন্দরে চলেছে এই জাহাজ, এমনি একটা নতুন বন্দর যদি পেত রাজারাম তা হলে বুঝি ধন্য হয়ে যেত সেও।

পায়ের কাছে তার জুতোপালিশের বাক্স। সোজা দাঁড়িয়ে আছে সে। গঙ্গার দমকা বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে তার চুল। কপাল থেকে চুল সরিয়ে সে দেখছে এই মানুষের মিছিল। দৈন্যে দুঃখে দুর্দশায় সকলকেই দেখাচ্ছে ঝ'ড়ো হাওয়ার পাখির মত— এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে যেন তাদের জীবনের সব-ক'টি পালক।

এদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের কোথায় যেন একটা মিল দেখতে পাচ্ছে রাজারাম। কিন্তু এ মিল থাকা সত্ত্বেও যেন একটা মস্ত গরমিলও আছে। এরা চলেছে তাদের জীবনের নতুন আশ্রয়ের উদ্দেশে, কিন্তু রাজারামের কোনো আশ্রয় নেই।

লোকজন চলেছে যেন এক-একটা আঁটি-বাঁধা হয়ে, এক-একটা পরিবারে ভাগ ভাগ হয়ে। হঠাৎ একটা চেনা মুখ যেন দেখতে পেল রাজারাম। প্রথমটা তার বিশ্বাস হল না, অবাক হয়ে গেল সে। কিন্তু না, ঠিক; ঠিকই দেখেছে সে। রাজারাম কাঠ হয়ে দাঁড়াল। ভুল হয় নি তার— ঠিকই সে চিনেছে ওদের। দল-সমেত রামেশ্বররা ততক্ষণে গ্যাংওয়ে ধরে এগিয়ে গেছে অনেকটা। রাজারাম এগতে পারল না, চীৎকার ক'রে ডেকে উঠল, মানিক মানিক মানিক।

সারাটা শরীর কেঁপে উঠল তার, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। প্রাণপণ শক্তিতে ডাকতে লাগল রাজারাম।

মানিক দূর থেকে ফিরে তাকাল, সঙ্গেসঙ্গে তাকাল রামেশ্বরও। ওইখান থেকে দেখেই তারা চিনে ফেলল লোকটাকে; অনেক বদল তার হয়েছে বটে কিন্তু একেবারে ওলট-পালট হয়ে সে যায় নি। মানিক বলল, রাজাদা। বাবা, ওই দেখ রাজাদা।

পিছন থেকে ভিড় এসে তাদের ঠেলে সোজা তুলে দিল ফ্ল্যাটে। নবঙ্গ ফিরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

ওই ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে মিশে রাজারাম বেপরোয়ার মত ঢুকে পড়তে চেষ্টা করেছিল ভিতরে। কিন্তু বাধা পেল সে। তার পরিচয়-পত্র কই। যার খুশি সেই এই জাহাজে উঠে সাগরপাড়ি দেবে, এমন তো নিয়ম নেই।

তবে নিয়মটা কি। উদ্বাস্তু ছিন্নমূল শরণাগত— যা-ই বল না কেন,

সেও তো তাই। সেও তো চায় নতুন বাসা বাঁধতে। তবু তার পথে বাধা কেন।

জাহাজ চলেছে আন্দামানে। যাদের ঘর গেছে, সংসার গেছে, বাস্তুভিটে গেছে, যাদের সহায় গেছে, সম্বল গেছে— তাদেরই জন্যে নতুন ঘর বাঁধার আয়োজন চলেছে সেখানে। সেখানে নতুন উপনিবেশ রচনা হবে। সেখানে নাকি কেবল নতুন জীবন নয়, নবজীবনের বনেদ তৈরি করা হবে।

উত্তম। রাজারাম প্রথমটা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চঞ্চল হয়ে লাভ নেই। স্থির হয়ে সে সব খবর নিতে লাগল। সমুদ্রের মাঝখানের সেই দ্বীপে বসতি বাঁধার জন্যে যা-যা দরকার, সবই নাকি যাবে সেখানে একে একে। আগেও গিয়েছে, আরও যাবে। চাষ-আবাদের জন্যে লাঙল যাবে, গোরু-মহিষ-বলদ যাবে।

ভাঙাহালের নৌকোর মত তার জীবন। সেই ভাঙাহালটাই তাই বুঝি সে আঁকড়ে ধরল। কিন্তু আক্ষেপ তার হল। তাকে তারা ঠিকমত দেখতে পেল কি না তা তার জানা হল না। আর, আর তার দেখা হল না সেই পরনের খড়কে-ডুরেটা, হাতের রুপোর বালা-ক'গাছি, আর নাকের নাকছাবিটা।

কিন্তু আক্ষেপ দিয়ে নিজেকে কাবু করে ফেলল না রাজারাম। সে সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল ক'দিন ধরে। নতুন উত্তম যেন দেখা দিয়েছে তার জীবনে। জীবনে একটা বন্দর তার চাইই।

ইতিমধ্যে আরও দুই জাহাজ লোকজন চলে গেছে, তাদের সঙ্গে গেছে নানা উপকরণ। সঙ্গে নিয়ে গেছে তারা কত যন্ত্রপাতি, কত হালের বলদ, কত গোরু মহিষ। কিন্তু ঘাটে রাজারামকে আর দেখা যায় নি। মরার জন্যে যুদ্ধ অনেকে করে, কিন্তু বাঁচার জন্যে যুদ্ধটাই

বেশি কঠিন লড়াই। সেই লড়াই নিয়ে রাজারাম এখন ব্যস্ত। এত চেষ্টা করেও সে কোনো সুবিধে ক'রে উঠতে পারে নি।

আউটরামঘাটে আবার জাহাজ ভিড়েছে। মস্ত চোঙ দিয়ে অল্প অল্প ফিকে ধোঁয়া ছাড়ছে জাহাজটা। কিন্তু আজ ঘাটে মানুষের তেমন ভিড় নেই। চাষ-আবাদের মালমসলাই আজ যাচ্ছে বেশি। আর যাচ্ছে গোরু মহিষ আর বলদ।

হঠাৎ দেখা গেল রাজারাম আহিরকে। কয়েকটা গোরু মহিষ খেদিয়ে নিয়ে সে জাহাজে উঠছে। তার চোখে-মুখে নতুন আশার একটা ঝিলিক। মধুবালার দুঃস্বপ্নটা বুঝি মুছে গেছে একেবারে। নতুন একটা স্বপ্নের মায়া যেন তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাতদানি দিচ্ছে।

পুরাতন কিনার ত্যাগ ক'রে তার জাহাজ নতুন বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করল। এপার ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল তার চোখে, হয়তো ধীরে ধীরে সেইসঙ্গে আর-একটা পার জেগে উঠতে লাগল নতুন সংকেতে।

একটা কথার খেলাপ হয়ে গেল কিন্তু। ফিরে গিয়ে তার শেষ সওদার সেই ভীষণ কথাটা হরবোলাকে আর বলে আসা হল না।